কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫৬
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী

হারজিত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

গরমের ছুটি। প্রচণ্ড গরমে মুসাদের ছাউনিতে বসে বরফের কুচি মেশানো কোকাকোলা খাচ্ছে গোয়েন্দারা। আর আফসোস করছে কোন রহস্য পাচ্ছে না বলে। একটা মনের মত কাজ চাই। বসে বসে আর সময় কাটে না।

কনস্টেবল ফগর্যাম্পারকটও নেই যে তার সঙ্গে দুষ্টামি করে সময় কাটাবে। ছদ্মবেশ নিয়ে তাকে ঠকিয়ে মজা পাবে। সে গেছে পুলিশের কি একটা ট্রেনিং দিতে। ট্রেনিং দিয়ে মগজটাকে কি পরিমাণ ক্ষুরধার করে আনবে সে-ব্যাপারেও ইঙ্গিত দিয়ে গেছে ওদেরকে। ভাবখানা এমন, যেন এরপর কোন কেসেই আর তার সঙ্গে জিততে পারবে না ওরা। পাত্তাই পাবে না।

ফারিহা বলল, 'চলো, আজ ঘোড়ার খেলা দেখতে যাই। টিনা যাবে।'

টিনা ওদের স্কুলে ওপরের ক্লাসে পড়ে। গ্রীনহিলসেই থাকে। ওর বাবা পুলিশ ক্যাপ্টেন রবার্টসনের বন্ধু।

গাঁয়ের মাঠে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। নানা রকম প্রতিযোগিতা হবে। তার মধ্যে ঘোড়ার কসরতও আছে। ফারিহার কাছে জানা গেল টিনাও যাবে কসরত দেখাতে। ঘোড়া খুব প্রিয় ওর। নিজের একটা ঘোড়া আছে। নাম সোবার।

ফারিহার প্রস্তাবে রাজি হলো সবাই।

বিকেল তিনটেয় মাঠে এল ওরা। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মুসা বলল, 'কোথায় ও?'

হাত তুলে বলল ফারিহা, 'ওই তো।'

ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

চমৎকার একটা ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে ওদেরই বয়েসী এক কিশোরী। লম্বা ছিপছিপে শরীর। সুন্দর চেহারা। পরনে ঘোড়ায় চড়ার উপযোগী পোশাক। আরও কাছে এলে দেখা গেল, নীল চোখ ওর।

কাছে এসে হেসে বলল টিনা, 'হাই, এসে গেছ। তোমাদের অপেক্ষাই করছি। দেরি দেখে মনে হচ্ছিল আর বুঝি এলেই না।'

'না না, আসব না কেন?' জবাব দিল ফারিহা। 'ফোনে যখন বলেছি আসব,

তো এসেছি। গরমের জন্যে বেরোতে দেরি করে ফেলেছি। যা রোদের রোদ, বাবারে বাবা!'

খেলা শুরু হলো খানিক পর। টিনার মতই আরও অনেক কিশোর-কিশোরী এসেছে ঘোড়া নিয়ে। নম্বর ধরে এক এক করে ডাক পড়তে লাগল ওদের। দড়িতে ঘেরা রিঙে ঢুকে খেলা দেখাতে লাগল ওরা।

টিনার ডাকও পড়ল, 'নাম্বার সেভেনটিন! নাম্বার সেভেনটিন! জলদি এসো!'

রিঙে ঢুকে গেল টিনা।

বাইরে থেকে উৎসুক হয়ে তার খেলা দেখতে লাগল গোয়েন্দারা।

ভালই খেলল টিনা। ঘোড়া নিয়ে প্রচুর নাচা-কুদা করল। প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর অবাক হয়ে শুনল, সে ফার্স্ট হয়েছে। এতটা ভাল করবে আশা করেনি। পুরস্কার হিসেবে রূপার কাপটা যখন তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো, তখনও তার বিশ্বাস হতে চাইল না।

মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর তার প্রচুর প্রশংসা করতে লাগল গোয়েন্দারা।

এই সময় এগিয়ে এল একজন পুলিশম্যান। নাম লয়েড। ফগের পরিবর্তে ডিউটি করছে। ডাকল, 'মিস হবসন, একটা খারাপ খবর আছে। তোমাদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এইমাত্র তোমাদের বাড়ি থেকে এলাম। ক্যাপ্টেন রবার্টসনও গিয়েছিলেন। তোমাদের কাজের বুয়া মিসেস টলমার তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছে তোমাকে। খুব মুষড়ে পড়েছে বেচারি।'

খবর বটে একটা! বিশেষ করে গোয়েন্দাদের কাছে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন কোথায়?'

'তদন্ত সেরে অফিসে চলে গেছেন,' লয়েড জানাল।

'কিছু পাওয়া গেছে?'

'না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল লয়েড। 'অবাক কাণ্ড! ডাকাতটা যেন মানুষ নয়...' আচমকা থেমে গেল সে। বাইরের কারও কাছে পুলিশের গোপন তথ্য বোধ হয় ফাঁস করতে চায় না।

সে খবর দিয়ে চলে যাওয়ার পর কিশোর বলল, 'টিনা, ইচ্ছে করলে আমাদের সাহায্য নিতে পারো তুমি। বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে আপত্তি নেই আমাদের।'

'কি সাহায্য?'

'ডাকাতকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি।'

ভাবতে লাগল টিনা। কিশোরদের গোয়েন্দাগিরির কথা তার অজানা নয়। পুলিশের চেয়ে, বিশেষ করে ফগের চেয়ে অনেক বেশি চালাক ওরা। কি করে কাজ করে, এটা জানারও কৌতূহল আছে। তাই রাজি হয়ে গেল। বলল, 'বেশ, চলো।'

বিকেল প্রায় শেষ। টিনাদের বাড়ি গিয়ে তদন্ত শেষ করে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই প্রবল আগ্রহ আর কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও মুসা, রবিন আর ফারিহা যেতে পারল না। বাড়ি ফিরে চলল ওরা।

কিশোর রওনা হলো টিনার সঙ্গে। টিটুকে সঙ্গে নেয়নি। টিনার ঘোড়াটার সঙ্গে বনে না কুকুরটার। সোবারের নামের মানে প্রশান্ত হলে কি হবে, আসলে মোটেও শান্ত নয় সে: বিশেষ করে টিটুর সঙ্গে ভদ্রতা করে শান্ত থাকতে একেবারেই নারাজ। টিটুও তার খুরওয়ালা পায়ে কামড়ে দিতে পারলে খুশি হত। কিন্তু অতবড় একটা জানোয়ারের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার সাহস তার হলো না।

ঝামেলা করবে অনুমান করে টিটুকে তাই ফারিহার সঙ্গে দিয়ে দিল কিশোর।

যেতে পারল না বলে মুখচোখ করুণ করে চলে গেল ফারিহা। কিশোরদেরকে যতক্ষণ চোখে পড়ল, বার বার ফিরে তাকাল।

দুই

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল টিনা। এক হাতে সোবারের লাগাম ধরে রেখে আরেক হাত নেড়ে কিশোরকে ডাকল, 'এসো।'

বিরাট বাগানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে লম্বা পথ। পথের মাথায় সুন্দর একটা বাড়ি। প্রচুর জানালা আছে। গাছপালায় ঘিরে রাখা বাড়িটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না।

বাড়ির কাছে এসে কিশোরকে দাঁড়াতে বলে সোবারকে নিয়ে চলে গেল টিনা। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কিশোরকে নিয়ে ঘুরে এগোল বাড়ির পেছন দিকে।

পেছনের একটা দরজায় টোকা দিতে খুলে দিল এক মহিলা। টিনাকে দেখেই চিৎকার দিয়ে উঠল। 'ও মা, এতক্ষণে এসেছ! পুলিশের লোকটা তোমাকে বলেনি? বলে দিতে বলে দিয়েছিলাম তো। যা একখান কাণ্ড ঘটে গেল না, কি আর বলব! এমন ভয় পাওয়া পেয়েছি, আয়নার মধ্যে নিজের ছায়া দেখলেও এখন চমকে উঠি!'

এই মহিলাই মিসেস টলমার, বুঝতে পারল কিশোর। অতিরিক্ত কথা বলে। ছোটখাটো, হাসিখুশি, আন্তরিক। চোখের তারা উজ্জ্বল। ধপ করে একটা ইজি চেয়ারে বসে পড়ে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল নিজেকে।

'বুয়া, কি হয়েছে?' টিনা জিজ্ঞেস করল। 'লয়েডের কাছে ডাকাতির খবর শুনলাম।...ও, বুয়া, এর নাম কিশোর পাশা। আমার বন্ধু। গোয়েন্দা। ক্যাপ্টেন

রবার্টসনেরও বন্ধু।'

'তাই নাকি! তাই নাকি! খুব ভাল কথা। ডাকাতির তদন্তে একজন গোয়েন্দাও থাকা উচিত…'

'একজন নয়, বুয়া, ওরা চারজন…না না, পাঁচ। একটা কুকুরও আছে।'

চোখ আরও উজ্জ্বল হলো মিসেস টলমারের। 'তাহলে তো আরও ভাল। ওরা কোথায়? বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছ নাকি?'

'না, ওরা বাড়ি চলে গেছে। কাজ আছে। তো, পুলিশ কি করে গেল?'

'ক্যাপ্টেন রবার্টসন খুব ভাল মানুষ। ধৈর্য ধরে সব দেখলেন, সব শুনলেন। অনেক প্রশ্ন করলেন আমাকে। আশ্চর্য, বুঝলে, টিনা! কোন মানুষ ওভাবে হাওয়া হয়ে যেতে পারে না!'

'কি হয়েছিল খুলে বলবেন, মিসেস টলমার?' অনুরোধ করল কিশোর।

'কি যে বলব বুঝতে পারছি না!' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মহিলা।

'ভয়ের কিছু নেই আর,' কিশোর বলল, 'ডাকাতেরা সাধারণত এক জায়গায় দু'বার ডাকাতি করতে আসে না। একবার করে যাওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি তো আসবেই না। অসুবিধে না হলে আপনি সব বলুন আমাকে।'

এক গল্প হাজারবার বলতেও অসুবিধে নেই মিসেস টলমারের। বলার জন্যে মুখিয়েই আছে। বলল, 'এখানেই বসে ছিলাম। উলের একটা মোজা বুনতে বুনতে চোখ লেগে এসেছিল। চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন ক'টা বাজে, এই চারটে হবে। হঠাৎ একটা শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল।'

'কিসের শব্দ?' জানতে চাইল টিনা।

'কি রকম শব্দ?' কিশোরের প্রশ্ন।

'থপ করে কিছু পড়ার শব্দ। বাগানের কোনখানে। মনে হলো কেউ যেন লাফিয়ে পড়ল।'

'তারপর?'

'দোতলায় কে যেন কাশল। পুরুষের কাশি। শব্দটা বিচিত্র। কেশে উঠেই এমন করে চেপে ফেলতে চাইল যেন কাউকে শুনতে দিতে চায় না। সন্দেহ হলো। সোজা হয়ে বসলাম। বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ নেই। টিনার বাবা মিস্টার হবসনও বাড়ি নেই। মিসেসকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন। আসবেন কয়েকদিন পর। তাহলে কে? সিঁড়ির কাছে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম–কে ওখানে? জলদি নেমে এসো। নইলে পুলিশ ডাকব।'

এক এক করে কিশোর আর টিনার মুখের দিকে তাকাল মিসেস টলমার। বোঝার চেষ্টা করল, তার গল্প বলার ভঙ্গি কতখানি ছাপ ফেলেছে ওদের ওপর।

টিনার নীল চোখে উত্তেজনা।

কিশোরের গভীর কালো চোখেও উত্তেজনা। বলল, 'দারুণ সাহসী মানুষ

আপনি, মিসেস টলমার। তারপর?'

প্রশংসায় খুশি হলো মহিলা। বলল, 'জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে দেখি একটা মই! বাগানের মালীর মই ওটা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। ওপরটা ঠেকানো মিসেস হবসনের বেডরুমের দেয়ালে। মই বেয়ে তাঁর ঘরে যাতে ঢোকা যায়। যা বোঝার বুঝে ফেললাম। চোর এসেছে! মনে মনে বললাম–চোর মহাশয়, তুমি যে-ই হও, আমার চোখ এড়িয়ে আর বাঁচতে পারবে না। মই বেয়ে নেমে এলে আমার চোখে পড়বেই। তোমার আঙুলের মাথা থেকে চুলের ডগা সবই আমার চোখে পড়বে। মুখ দেখতে পাব। ডাকাতের চেহারা চিনে রাখাটা খুবই জরুরী, জানা আছে আমার।'

'হ্যাঁ, জরুরী,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ডাকাতটার চেহারা কেমন দেখলেন?'

'জানি না!' হঠাৎ করে চেহারার ভঙ্গি বদলে গেল মিসেস টলমারের। আবার চোখে ভয় ফুটল। 'জানি না তার কারণ মই বেয়ে সে নেমে আসেনি!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ওপর থেকে তাহলে নামল কি করে সে? আর কোন শব্দ শুনেছেন? ডাকাতটার পালানোর শব্দ?'

'না। আমি ছিলাম হলঘরে, সুতরাং সে সিঁড়ি দিয়ে নামলে অবশ্যই দেখতে পেতাম। সারা বাড়িতে ওপর থেকে নামার আর কোন পথ নেই, ওই একটা মাত্র সিঁড়ি। ওখানে দাঁড়িয়ে মইয়ের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরও যখন লোকটা নামল না, টেলিফোনের ওপর চোখ পড়ল আমার। মনে হলো ফোনটা আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে পুলিশকে ফোন করলাম। কিন্তু ফগর‍্যাম্পারকটকে পাওয়া গেল না। কেউ ধরল না। পরে জেনেছি বাড়ি নেই সে।'

'ডাকাতটা কি তখনও ওপরতলাতেই ছিল?'

সরাসরি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মিসেস টলমার বলতে থাকল, 'ফোন শেষ করে সবে রিসিভারটা রেখেছি, এই সময় রুটিওয়ালা ডুডিলকে আসতে দেখলাম। ধড়ে যেন প্রাণ এল। তাকে জানালাম বাড়িতে ডাকাত ঢুকেছে। ডুডিল মানুষ ছোটখাট হলে কি হবে, খুব সাহসী লোক। দেখতে যেতে চাইল। তাকে নিয়ে ওপরতলায় গেলাম। মিসেস হবসনের বেডরুমে কাউকে পেলাম না। ওপরতলার কোন ঘরে খোঁজা আর বাদ রাখিনি। কিন্তু ডাকাত তো ডাকাত, কোন মানুষের ছায়াও দেখলাম না!'

'অন্য কোন ঘরের জানালা দিয়ে পালায়নি তো?'

'সম্ভব না! সব জানালা বন্ধ। ছিটকানি লাগানো। একটাও খোলা দেখলাম না। আর খোলা হলেও জানালা দিয়ে লাফিয়ে নামা যাবে না। অত ওপর থেকে লাফ দিলে নির্ঘাত পা ভাঙবে। তোমাকে বলেছি, সিঁড়িটা ছাড়া নামার আর কোন পথ নেই। সাংঘাতিক এক ধাঁধা!'

'ওপরেই তাহলে কোথাও লুকিয়ে ছিল, আপনারা দেখতে পাননি। হতে পারে না এ রকম?'

'না, পারে না। ওপরতলায় খুঁজে নেমে এলাম আমরা। এই সময় মালীকে আসতে দেখে তাকে পুলিশ ডেকে আনতে পাঠাল ডুডিল। হলঘরে বসে রইলাম আমরা। ভাগ্য ভাল, কি একটা কাজে গাঁয়ে এসেছিলেন পুলিশ ক্যাপ্টেন রবার্টসন। খবর পেয়ে তিনি এলেন। সঙ্গে লয়েড নামে আরেকজন পুলিশম্যান। ওপরতলায় গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে দু'জনে। খাটের নিচ, আলমারি, গলি-ঘুপচি-কোণা, কোন কিছুই বাদ দেয়নি। পায়নি কাউকে। আমি কাশি শোনার পর পরই যেন গায়েব হয়ে গেল ডাকাতটা। বেমালুম গায়েব! বাতাস হয়ে গেল! জাদু জানে যেন! নইলে আমার চোখকে ওভাবে ফাঁকি দিয়ে পালাল কি করে সে?'

তিন

মিসেস টলমারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, টিনার মায়ের রূপার একটা হাতঘড়ি, কিছু গহনা, টিনার বাবার একটা দামী সিগারেট কেস চুরি গেছে।

টিনাকে নিয়ে ওপরতলায় এল কিশোর। ঘরগুলো দেখতে লাগল। সবগুলো ঘরেরই জানালা বন্ধ, কেবল টিনার মায়ের বেডরুমের একটা জানালা বাদে। ওটার নিচে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আছে এখনও মইটা।

আর কোনখান দিয়ে নেমে যাওয়ার পথ আছে কিনা খুঁজে দেখল। নেই।

যে ঘর থেকে জিনিস চুরি গেছে, অর্থাৎ টিনার মায়ের বেডরুমে ফিরে এল আবার কিশোর। জানালার পাশে দেয়ালে নোংরা দস্তানা পরা হাতের ছাপ লেগে আছে।

পাকা চোর নয় লোকটা—ভাবল সে, নইলে এ ভাবে ছাপ ফেলে যেত না। সাড়ে আট সাইজের দস্তানা হবে, নয়ও হতে পারে, তারমানে লোকটা বিশালদেহী। চকচকে পালিশ করা ড্রেসিং টেবিলেও ছাপ লেগে আছে। চোরটাকে ধরা বোধ হয় কঠিন হবে না। এতবড় হাত সাধারণত দেখা যায় না। খেয়াল রাখতে হবে, গাঁয়ে এই সাইজের হাতওয়ালা কে আছে।

আবার জানালাটার কাছে ফিরে এল কিশোর। মাথা বের করে নিচে তাকাল। মই বেয়ে ওপরে ওঠাটা সহজ, কিন্তু নামল কোন পথে? লাফিয়ে নামা সম্ভব না, তাহলে পা ভাঙবে। এই ঝুঁকি নেবে না চোর। তা ছাড়া জানালা সব বন্ধ। না খুলে লাফই বা দেবে কি করে?

খুঁজতে খুঁজতে একটা বক্সরুম পাওয়া গেল। তাতে ছোট একটা জানালা।

একপাশে পানির পাইপ। ওই পাইপ বেয়ে নেমে যাওয়া যায়. কিন্তু জানালাটা এতই ছোট, ওটা দিয়ে বড় কোন মানুষ বেরোতে পারবে না। খুব ছোট শরীরের কেউ হলে হয়তো পারবে। তবে ওটাও বন্ধ। ওখান দিয়ে বেরোলে অবশ্যই খোলা রেখে যেতে হত। কিন্তু বন্ধ। সুতরাং এখান দিয়েই বেরিয়েছে এ কথাও বলা যাচ্ছে না।

দেখা শেষ করে টিনাকে নিয়ে আবার নিচতলায় নেমে এল কিশোর।

মিসেস টলমার জিজ্ঞেস করল, 'কিছু পেলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। ছোট শরীরের মানুষ হলে বক্সরুমের জানালাটা দিয়ে কোনমতে মোড়ামুড়ি করে বেরোতে পারবে। কিন্তু ওটাও বন্ধ।'

'ঠিক, ক্যাপ্টেনও আমাকে এই কথাই বলেছেন। তিনিও বন্ধ পেয়েছেন জানালাটা। তবে খোলা থাকলেও সন্দেহ করা যেত না। চোরটা বিশালদেহী। ওর হাতের ছাপ দেখে বোঝা যায়। বাইরে পায়ের ছাপও আছে, বড় বড়।'

'তাই নাকি? দেখতে হয়।'

বাগানে বেরিয়ে এল কিশোর। মইয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়াল। বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ আছে। জুতোর মাপ বারো নম্বরের কম হবে না। মানুষ না দৈত্য!

পকেট থেকে ফিতে বের করে ছাপ মাপল কিশোর। নোটবুকে লিখে রাখল। সোলের ডিজাইনের ছাপ পড়েছে মাটিতে। দেখে দেখে অবিকল ওরকম করে এঁকে রাখল।

ক্যাপ্টেন দেখে গেছেন এই জায়গা। তিনি ফগর‍্যাম্পারকট নন, ভুল করবেন না; তবু কোন জিনিস পড়ে আছে কিনা দেখার জন্যে ভাল করে ঝোপের ভেতরটা দেখল কিশোর। নেই।

অদ্ভুত একটা ছাপ দেখতে পেল। গোল, তার ভেতরে জানালার খড়খড়ির মত ডিজাইন। অস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। কি জিনিসের ছাপ ওটা?

মিসেস টলমারকে জিজ্ঞেস করতে এল সে।

মিসেস টলমার বলল, 'তোমার চোখেও পড়েছে? ক্যাপ্টেনও জিজ্ঞেস করছিলেন। বড় কিছুর ছাপ হবে। এতবড় কোন জিনিস চুরি গেছে কিনা জানি না এখনও। আমি নিজেও দেখেছি ছাপটা। বুঝতে পারিনি কি জিনিস রেখেছিল। কি যে রাখল কে জানে!'

আর কিছু দেখার নেই। তেমন কিছুই খুঁজে পেল না কিশোর। পাওয়ার কথাও নয়। তার আগে দু'দুজন পুলিশম্যান এসে দেখে গেছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন, তাঁর চোখ এড়াবে না কিছু। আর কোন সূত্র চোখে পড়লে তুলে নিয়ে যাবেনই।

হতাশই হলো কিশোর।

মিসেস টলমার আর টিনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে চলল।

চার

পরদিন সকালে লয়েডের সঙ্গে দেখা করতে চলল কিশোর।

দরজায় টোকা দিতে ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

'আমি। কিশোর পাশা।'

এক মুহূর্ত নীরবতার পর জবাব এল, 'ভেতরে এসো।'

কিশোরকে দেখে হেসে বলল লয়েড, 'আমি জানতাম তুমি আসবে। কাল তোমার ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন আমাকে ক্যাপ্টেন রবার্টসন। সামনে রহস্য পেলে সেটার তদন্ত না করে ছাড়বে না তুমি।'

যাক, ভাল হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। লয়েডের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

লয়েডই জিজ্ঞেস করল তাকে, 'হ্যরসনদের বাড়ির ডাকাতির ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছ তো?'

বাহ্, আরও অগ্রগতি। খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'বলো, কি জানতে চাও?'

'কি কি সূত্র পেয়েছেন আপনারা ওখানে?'

'তেমন কিছু না। দস্তানা পরা বড় বড় হাতের ছাপ, বিশাল পায়ের ছাপ, এ সব। চোরটাকে ঢুকতেও দেখেনি কেউ, বেরোতেও দেখেনি। যেন অদৃশ্য মানব।'

হাসল কিশোর। 'মিসেস টলমারও তাই বলেছে। এতবড় শরীরের একজন মানুষ দিনে-দুপুরে চুরি করে নিয়ে উধাও হয়ে গেল, কারও চোখে পড়ল না ব্যাপারটা, আশ্চর্য। আর কোন সূত্র পাননি, না?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল লয়েড। বলবে কিনা দ্বিধা করছে। শেষে মাথা ঝাঁকাল, 'ক্যাপ্টেন যখন তোমাকে বিশ্বাস করেন, আমার না করার কিছু নেই।' পকেট থেকে দুই টুকরো ময়লা লাগা কাগজ বের করল সে। একটাতে লেখা:

2. Berington

আরেকটাতে:

1. Ricks.

উল্টেপাল্টে কাগজ দুটো দেখে জানতে চাইল কিশোর: 'মানে কি এর?'

'জানি না। ওয়ান এবং টু, এ দুটো সিরিয়াল নম্বর হতে পারে। বাকি দুটো কোন জায়গার নাম। ঝোপের কাছে যেখানে পায়ের দাগ ছিল, তার কাছে

পেয়েছি। ক্যাপ্টেন আমাকে রাখতে দিয়েছেন। এত ছোটখাট ব্যাপার তাঁর তদন্ত করার সময় নেই।'

'আপনি করবেন?'

'না। ফগর‍্যাম্পারকটকে খবর পাঠানো হয়েছে, সে চলে আসবে। আমি আসলে শহরের লোক, গাঁয়ে সুবিধে করতে পারছি না।'

'ফগ আসছে! কখন?'

'তার আসার কথা শুনে খুশি হয়েছ মনে হচ্ছে?' মিটিমিটি হাসছে লয়েডের চোখ। 'তার সঙ্গে তো তোমাদের শত্রুতা, না এলেই ভাল না?'

জবাব দিল না কিশোর।

লয়েড বলল, 'আজ বিকেলে আসছে। সে এলেই তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব। আর কোন প্রশ্ন?'

আর কিছু জানার নেই কিশোরেব। মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল।

লয়েডও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল, 'ইয়ে, একটা কথা–আমি চলে গেলেও খবর রাখব। হারজিত কার হয়, জানব।'

'হারজিত মানে?'

'তোমাদের আর ফগের মধ্যে তদন্তের লড়াই হবে না? কে আগে জেত, জানার জন্যে কৌতূহল থাকবে না আমার?'

তা থাকবে। মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তবে আমার মনে হয়, জিত তোমাদেরই হবে। ক্যাপ্টেন কাল কি বলেছেন জানো? বলেছেন, ডাকাতটাকে আমরা খুঁজে বের করতে না পারলেও কিশোর পাশা ঠিকই করে ফেলবে।'

গর্বে বুক আধহাত ফুলে গেল কিশোরের। লয়েডকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল। সাইকেল নিয়ে ছুটল মুসাদের ছাউনিতে। কাল সন্ধ্যা থেকে অনেক খবর জমে আছে। জানাতে হবে ওদের।

ছাউনিতে এসে বন্ধুদের সব কথা খুলে বলল কিশোর। শেষে বলল, 'পালানোর মাত্র দুটো পথ ছিল, বুঝলে–মই বেয়ে, কিংবা সিঁড়ি দিয়ে। হলে দাঁড়িয়ে ছিল টিনাদের বুয়া, দুই দিকে নজর রেখেছিল। কোনটা দিয়েই নামতে দেখেনি চোরকে।'

'ওপরতলার অন্য কোন জানালা দিয়ে পালিয়েছে,' মুসা বলল।

'সবগুলো বন্ধ ছিল। জানালাগুলো মাটি থেকেও অনেক ওপরে। লাফিয়ে নামতে গেলে পা ভাঙবে।'

'পানির পাইপ বেয়ে নামতে পারে।'

'পাইপ আছে একটা খুব ছোট জানালার পাশে। ওটা দিয়ে বড় মানুষ বেরোতে পারবে না। বড় হোক আর ছোট হোক, ওপথে কেউ বেরোয়নি। এর

প্রমাণ, জানালাটা বন্ধ ছিল। ভেতর থেকে আটকানো।'

'তাহলে আর কি? ভূতের কাজ!'

হাসল কিশোর। দস্তানা আর পায়ের ছাপের নকশা দেখাল। তারপর বলল, 'ভূত হলে পায়ের ছাপ পড়ত না। হাতের ছাপও না। ওরা অশরীরী। তা ছাড়া ভূত বলে কিছু নেই। স্রেফ কল্পনা।'

'তাহলে দৈত্য?'

'ওই-একই ব্যাপার। দৈত্য বলেও কিছু নেই। প্রাগৈতিহাসিক কালে হলে ডাইনোসরদের কথা বলতে পারতাম। এখন প্রাগৈতিহাসিক কাল নয়। দাগগুলোও ডাইনোসরদের মত নয়। সুতরাং এগুলো কোন মানুষেরই ছাপ, শরীরটা যার বিশাল।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

রবিন জানতে চাইল, 'আর কোন সূত্র পাওয়া গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। দুই টুকরো কাগজে অদ্ভুত দুটো নাম। নাম্বার টু দিয়ে লিখেছে বেরিংটন। ওয়ানের পর রিকস। কি মানে এগুলোর কে জানে!'

'বেরিংটন,' মনে করার জন্যে ভাবতে গিয়ে কপাল কুঁচকে ফেলল ফারিহা। 'বেরিংটন···বেরিংটন···কোথায় শুনলাম নামটা?'

'বেরিংটন থেকে তোমার কোন বন্ধু চিঠি লেখেনি তো?' মুসা জানতে চাইল।

'না না···দাঁড়াও, মনে পড়েছে। জায়গাটা নদীর ধারে, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। টুরিস্টরা যায়। বেরিংটন ব্রুক।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'ওখান থেকে সেদিন এক মহিলা এসেছিল খালার কাছে; কাজ পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে।'

'গুড,' প্রশংসার দৃষ্টিতে ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর। 'মনে রাখতে পারাটা খুব ভাল। ওখানে যাব আমরা। বিশালদেহী কোন মানুষ দেখলে তার ওপর নজর রাখব।'

'নাম্বার ওয়ানটা কি?' রবিনের প্রশ্ন। 'রিকস?'

কেউ জবাব দিতে পারল না।

কিশোর বলল, 'এক কাজ করব আমরা। ঘুরে বেড়াব। বাড়িঘরের নেমপ্লেট দেখব। বাড়ির নামও হতে পারে এটা, মানুষের নামও। সবাই মিলে চেষ্টা করলে রিকসকে হয়তো আবিষ্কার করেও ফেলতে পারব।'

পাঁচ

সেদিন বিকেলেই এসে হাজির হলো ফগর‍্যাম্পারকট। ট্রেনিং থেকে এসেছে। ভাবভঙ্গিই বদলে গেছে তার। কেউকেটা হয়ে গেছে যেন। ক্যাপ্টেন রবার্টসনও তার কাছে তুচ্ছ। লয়েডের সঙ্গে কথা বলার সময় এ রকম আচরণই করতে থাকল।

ডাকাতির কথা তাকে খুলে বলতে লাগল লয়েড।

কিশোরের কথা উঠতেই গম্ভীর হয়ে গেল ফগ। 'ঝামেলা! ওই বিচ্ছুটা! জেনে ফেলেছে! তাকে না জানিয়ে আর পারলে না!'

'আমি জানাইনি। মিস্টার হবসনের মেয়ে টিনা ওর বন্ধু। খবর শুনে ওর সঙ্গেই চলে গেছে তদন্ত করার জন্যে।'

রাগ করে ফগ বলল, 'কি আর বলব, যত দোষ ক্যাপ্টেনের। তিনিই ছেলেটাকে মাথায় তুলেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো? যেখানেই কিছু ঘটবে, সেখানেই হাজির থাকবে কিশোর পাশা। প্রেসিডেন্টের বাড়িতে ডাকাতি হলে সেখানেও তাকে হাজির দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'বুদ্ধি আছে ছেলেটার,' বলল লয়েড। ফগ রাগল কি হাসল, কেয়ার করল না। কাগজের টুকরো দুটো বের করে দিয়ে বলল, 'আমার দায়িত্ব শেষ। আমি পালাই। গাঁয়ে থাকতে আমার একটুও ভাল্লাগে না।'

'ঠিক আছে, যাও। খবর পাবে। শীঘ্রি ধরে ফেলব চোরটাকে। এ সব কাজ করে করে হাত পেকে গেছে আমার। তার ওপর ট্রেনিং নিয়ে এলাম। আমার চোখে ফাঁকি দেয়ার সাধ্য এখন কোন অপরাধীর নেই।'

হাসল লয়েড। ব্যঙ্গ করল কিনা বুঝতে পারল না ফগ।

লয়েড চলে যাওয়ার পর ইজি চেয়ারে জাঁকিয়ে বসল সে। কাগজের টুকরো দুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

ফোন বাজল একটু পর। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল ফগ। ভারিক্কি চালে বলল, 'পুলিশ!'

ওপাশের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'এখুনি আসছি, ম্যাডাম,' বলে রিসিভার রেখে দিল। টুপিটা তুলে মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সাইকেলে চেপে রওনা হলো।

'এবার আর হতচ্ছাড়া ছেলেমেয়েগুলো জ্বালাতে পারবে না,' সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবল সে। 'খবর পেয়ে ওরা যাওয়ার আগেই কাজ শেষ করে

চলে আসতে পারব।

মোটা মানুষ। ভীষণ গরমে মুহূর্তে ঘেমে নেয়ে গেল শরীর।

একটা বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নেমে গেট খুলল সে। ভেতরে ঢুকে আবার সাইকেলে চেপে এসে থামল সদর দরজার সামনে। ঘণ্টা বাজাল।

দরজা খুলে দিল স্বয়ং কিশোর পাশা।

হাঁ হয়ে গেল ফগ। কথা সরল না মুখ দিয়ে। অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করে কেবল বলল, 'ঝামেলা!'

হাসল কিশোর। 'গুড আফটারনুন, মিস্টার ফগ।'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' গর্জে উঠল ফগ।

'সরি, ফগর‍্যাম্পারকট। আসুন, ভেতরে আসুন। কেমন আছেন? আপনার জন্যেই বসে আছি আমরা।'

'তোমরা এখানে কি করছ? আমাকে জ্বালাতে এসেছ? এত তাড়াতাড়ি খবর পেলে কি করে?'

'কিসের খবর?'

'ডাকাতির...' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল ফগ। তার মনে হলো, কিশোরের শয়তানি না তো সব? সে গাঁয়ে এসেছে খবর পেয়েই রসিকতা করে ভোগানোর জন্যে মিথ্যে কথা বলে তাকে ডেকে এনেছে! ফোনে চিঁ-চিঁ কণ্ঠ শুনেই তার সন্দেহ হয়েছিল। কঠোর দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে রসিকতা! দাঁড়াও, ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করে এবার তোমাকে হাজতে না ভরেছি তো...'

কথা শেষ হলো না তার। গন্ধ পেয়ে গেছে টিটু। 'খউ! খউ!' করে চিৎকার দিতে দিতে ভেতর থেকে বন্দুকের গুলির মত ছুটে বেরোল। অনেক দিন পর পা কামড়ানোর মানুষ পেয়েছে। মহা আনন্দে ছুটে গেল ফগের দিকে।

'এই, রবিন, ওকে ছাড়লে কেন?' ভেতরের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল কিশোর।

তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল রবিন। টিটুকে আটকাল। সাইকেলে চড়ে ততক্ষণে আবার গেটের দিকে রওনা হয়ে গেছে ফগ। তার আর কোন সন্দেহ নেই, শয়তানি করার জন্যেই তাকে ফোন করেছে কিশোর। গলা বদলে ওরকম করে কথা বলাটা কিছুই না বিচ্ছুটার জন্যে।

পেছনে মহিলা কণ্ঠে চিঁ-চিঁ করে কথা শোনা গেল, 'কে, কিশোর? পুলিশ? ভেতরে আসতে বলো।'

'বলব কি?' হা-হা করে হাসছে কিশোর। 'এসেই কুত্তার ভয়ে পালাচ্ছে। এমন ভীতু পুলিশম্যান আমি জনমে দেখিনি! হা-হা-হাহ্!'

'ওটাকে খবর দেয়া না দেয়া সমান কথা!' রাগে ফেটে পড়ল মহিলা। 'কোন

কাজের না! তোমরাই ওর চেয়ে ভাল। ভাগ্যিস এসেছিলে! নইলে ভয়েই হার্টফেল করতেন মিসেস মারগট!'

হঠাৎ করে ঘটে গেছে ঘটনাটা। মুসা আর ফারিহাকে নিয়ে কার বাড়িতে যেন দাওয়াত খেতে গেছেন মিসেস আমান। কিশোর চলে এসেছে রবিনদের বাড়ি। রবিনও তাকে নিয়ে এসেছে চা খাওয়ার জন্যে।

বাগানে বসে খাচ্ছিল ওরা। এই সময় পাশের বাড়ি থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'ডাকাত! ডাকাত! ধরো! ধরো!'

মুহূর্তে দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে রবিন আর কিশোর। টিটুকেও পার করে এনেছে। চিৎকার করছে মিসেস মারগট। ওদের দেখে জানালা দিয়ে হাত নেড়ে ডাকল, 'এসো! জলদি এসো!'

পেছনের দরজার দিকে ছুটল ওরা। রান্নাঘরে কেউ নেই। টেবিলে জিনিসপত্রের স্তূপ, মুদি দোকান থেকে আনা। বড় বড় চারটে রুটি পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দরজার ধারে পড়ে আছে একটা ছোট প্যাকেট। সম্ভবত চিঠির প্যাকেট, ডাকপিয়ন রেখে গেছে।

কোথায় কি আছে পলকে সব মনে গেঁথে নিল কিশোরের তীক্ষ্ণ চোখ। রান্নাঘরের দরজা খোলা। তারমানে এদিক দিয়েও পালাতে পারে চোর। কালকের চোরটাই না তো?

বসার ঘরে সোফায় বসে আছেন বৃদ্ধা মিসেস মারগট। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। ভীষণ ভয় পেয়েছেন। রবিনকে দেখেই বললেন, 'আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা এনে দেবে, প্লীজ! ওই ড্রয়ারে আছে।' পুরানো আমলের মানুষের মত তিনি এখনও স্মেলিং সল্ট ব্যবহার করেন।

আনতে গেল রবিন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মিসেস মারগট?'

'এখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ ওপরে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপর শুনলাম একটা ভারি কাশির শব্দ। বিচিত্র। ওরকম শব্দ ভেড়ায় করে।'

'ভেড়ায় করে!'

'হ্যাঁ। ভয় পেয়ে গেলাম। সোজা হয়ে বসলাম। তারপর ভয় কাটিয়ে পা টিপে টিপে এগোলাম হলের দিকে। কে যেন আমাকে পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে আলমারির ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। দেখলাম না। পাল্লা লাগিয়ে তালা দিয়ে দিল।'

এই সময় সামনের দরজায় তালা খোলার শব্দ হলো। পাল্লা খুলে বন্ধ হলো।

'কে এল?' কিশোরের প্রশ্ন।

'নিশ্চয় কোরি। এল তাহলে! আহ্, বাঁচা গেল! আমার সঙ্গে থাকে। আমাকে সঙ্গ দেয়।'

ছয়

বসার ঘরে ঢুকল মাঝবয়েসী ছোটখাট এক মহিলা। সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কেম লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। ঢুকেই আঁচ করে ফেলল, কিছু ঘটেছে। মিসেস মারগটে দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? চেহারার এই অবস্থা কেন?'

পাখির মত চিঁ-চিঁ করে কথা বলে মহিলা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

কিশোরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস মারগট. মহিলার নাম কোরি কন। কি হয়েছে আবার সব গোড়া থেকে বলতে লাগলেন। আলমারিতে ভ তাঁকে তালা লাগিয়ে দেয়ার কথায় না আসা তক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগ কিশোর।

'আলমারিতে আটকে থেকে শুনতে থাকলাম,' মিসেস মারগট বললেন 'ওপরতলায় ভারি পায়ের শব্দ। ড্রয়ার টানার শব্দ শুনলাম। আবার নিচে নেমে এল লোকটা। আলমারিটা সিঁড়ির গোড়ায় বলে তার নামার শব্দ শুনতে পেয়েছি। আবার শুনেছি তার অদ্ভুত কাশির শব্দ।'

থেমে গেলেন মিসেস মারগট। শব্দটার কথা মনে করে গায়ে কাঁটা দিল তাঁর।

'তারপর?' জানার জন্যে ফেটে যাচ্ছে কিশোর 'আলমারি থেকে বেরোলেন কি করে? তালা কে খুলল?'

'বোধহয় চোরটাই। ওর নেমে আসার শব্দ শুনে এতটাই ভয় পেয়েছিলাম, বেহুঁশই হয়ে গিয়েছিলাম হয়তো। হুঁশ হলে দেখি একগাদা জুতো-স্যাণ্ডেলের ওপর পড়ে আছি। দরজায় হাতের চাপ লাগতেই খুলে গেল। তারমানে তালাটা খুলে দিয়ে গেছে।'

'হুমম!' আনমনে নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কেটে কোরির দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস কন, পুলিশকে ফোন করা দরকার। আপনি করুন। আমি একটু ঘুরে দেখে আসি। চমৎকার একটা কেস।'

কোরির ফোন পেয়েই ফগ এসেছিল। সে-জন্যেই ভেবেছে, চিঁ-চিঁ করে কথা শুনলাম।

যাই হোক, আগের কথায় ফিরে আসা যাক। কোরি ফোন করতে গেল পুলিশকে। কিশোর গেল তদন্ত করতে। সে নিশ্চিত, টিনাদের বাড়িতে যে লোক ডাকাতি করেছে, এখানেও সে-ই এসেছিল।

দোতলায় উঠল কিশোর। যা ভেবেছিল তাই। বেডরুমের দেয়ালে দরজার

ঠিক পাশে দস্তানা পরা বিশাল হাতের ছাপ লেগে আছে।

বাগানেও কি পায়ের ছাপ আছে? সেটা দেখার জন্যে নিচে নামল কিশোর। এই সময় ঘন্টা বাজল। দরজা খুলেই দেখে ফগ দাঁড়িয়ে আছে। এত তাড়াতাড়ি এল কি করে সে, ভেবে অবাক হলো কিশোর। হতাশও লাগল. তদন্ত তখনও শেষ হয়নি বলে। ফগ চলে এসেছে। তাকে আর কিছু করতে দেবে না।

তবে ভুল বুঝে ফগ আবার চলে যাওয়ায় খুব খুশি হলো সে। ইচ্ছে করলে ডাকাডাকি করে ফেরাতে পারত, কিন্তু ফেরাল না।

টিটুকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল রবিন। গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে গেল কোরি। বাগানে বেরিয়ে এল কিশোর

সামনের অংশে কিছু পাওয়া গেল না। মনে পড়ল, রান্নাঘরের দরজা খোলা পেয়েছে। ওদিক দিয়ে চোর ঢুকতে পারে। ঘুরে সেদিকে চলে এল।

বসার ঘরের একটা জানালার নিচে ফুলের বেডের ধারে নরম মাটিতে বড় বড় দুটো পায়ের ছাপ দেখতে পেল সে। অস্ফুট শব্দ করে উঠল। নিশ্চয় এখানে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েছিল চোরটা। মিসেস মারগটকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছে।

আরেকটা বেডের কাছে আরও কিছু ছাপ পড়েছে। হাঁটাহাঁটি করেছিল নাকি এখানে চোরটা! টিনাদের বাগানে যে রকম কাগজের টুকরো পাওয়া গেছে, সে-রকম পাওয়া যাবে?

কিন্তু পাওয়া গেল না। তবে অদ্ভুত গোল বস্তুটার ছাপ আছে রান্নাঘরের দরজা থেকে চলে যাওয়া ধুলো ঢাকা পথটাতে। এ কিসের দাগ? অবাক হয়ে আরেকবার ভাবতে হলো কিশোরকে।

আর কিছু পাওয়া গেল না। বসার ঘরে ঢুকল কিশোর। কোরি জানাল, ফগ ফোন করেছিল। সত্যি সত্যি তখন তাকে তদন্ত করার জন্যে ফোন করা হয়েছিল, নাকি কিশোর রসিকতা করেছিল, জানার জন্যে। বকে দিয়েছে তাকে, কোরি। লজ্জিত হয়েছে ফগ। আবার আসছে। বলল ফোন রেখেই রওনা হয়ে যাবে।

হাসল কিশোর। আসুক। আর অসুবিধে নেই। ফগের আগেই তদন্ত সেরে ফেলেছে সে।

রান্নাঘরের টেবিলে রাখা জিনিসগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কে এনেছে এগুলো? আপনাদের রাঁধুনী আছে?'

'আছে। তবে আজ তার ছুটি। রান্নাঘরের দরজা খুলে রেখে গেছিলাম আমি যাতে মুদির মেয়েটা জিনিসপত্র রেখে যেতে পারে। রুটিওয়ালাও এসেছিল, দেখতেই পাচ্ছি। ডাকপিয়নও। দুপুরের পর সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েন মিসেস মারগট। তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে বলে কখনও ঘন্টা বাজায় না ওরা। রাঁধুনী না থাকলে চুপচাপ জিনিস রেখে চলে যায়।'

কি চুরি হয়েছে, জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জানা গেল, মিসেস মারগটের কিছু গহনা পাওয়া যাচ্ছে না।

আরও নানা প্রশ্ন করল কিশোর। নির্দ্বিধায় জবাব দিল কোরি।

ওরা কথা বলছে, এই সময় গেটে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল। উঁকি দিয়ে কিশোর দেখল, ফগ এসেছে।

এখানকার কাজ আপাতত শেষ। রবিনকে নিয়ে ফিরে চলল কিশোর।

সাত

পরদিন মুসাদের ছাউনিতে মীটিং বসল। ডাকাতির ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর কি ভাবে তদন্ত চালাবে, তার একটা ছক করা হলো। সূত্র যা আছে, সেগুলোর ওপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে।

ঠিক হলো, মুদির মেয়ে, ডাকপিয়ন আর রুটিওলার সঙ্গে কথা বলবে ওরা। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করবে।

ফারিহা যাবে মুদির মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে। রবিন বলবে পিয়নের সঙ্গে, আর মুসা রুটিওয়ালার সঙ্গে। ছদ্মবেশে কিশোর যাবে বেরিংটন ক্রকে, বিশালদেহী লোক খুঁজতে–যার জুতোর সঙ্গে ডাকাতের ফেলে যাওয়া ছাপের মিল আছে। তাকে পেলে তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করবে।

যার যার কাজ ভাগ করে দিয়ে টিটুকে নিয়ে চলে গেল কিশোর।

রবিন আর মুসা আলোচনা করে ঠিক করল, বাড়িতেই বসে থাকবে। রুটিওয়ালা রোজই আসে, তখন তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। ডাকপিয়নও আসে নিয়মিত। যদি চিঠিপত্র না থাকে, পিয়ন না আসে, তাহলে পোস্ট অফিসে যাওয়া যাবে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বেরোতে ইচ্ছে করল না ওদের। তা ছাড়া পোস্ট অফিসে অনেক লোক যাতায়াত করে, ওদের সামনে প্রশ্ন করতে স্বস্তি পাবে না রবিন।

গরম কিংবা অন্য কোন কিছুর পরোয়া করল না ফারিহা। সে তখনই বেরিয়ে পড়ল। তবে মুদির দোকান পর্যন্ত যাওয়া লাগল না। তার মেয়েকে ভ্যান গাড়ি নিয়ে আসতে দেখল। মাল ডেলিভারি দিতে চলেছে লোকের বাড়িতে। তাকে চেনে ফারিহা। ফারিহাকেও চেনে মেয়েটা। সুতরাং কথা বলতে অসুবিধে হলো না।

মুদির মেয়ে আর ডাকপিয়নের সঙ্গে সহজেই কথা বলা গেল। তথ্য বিশেষ পাওয়া গেল না। একটা কথাই কেবল জানা গেল, আগের বিকেলে মিসেস

মারগটের রান্নাঘরে ঢুকেছিল মুদির মেয়ে। টেবিলে মাল রেখে চলে আসে। তিনজনের মধ্যে সবার আগে সে-ই ঢুকেছে। কারণ সে টেবিলে রুটি কিংবা দরজার পাশে চিঠির প্যাকেট দেখতে পায়নি।

ডাকপিয়নও টেবিলে রুটি দেখেনি।

দু'জনেই জানাল, সকালে ওদের সঙ্গে দেখা করেছে ফগ। অনেক প্রশ্ন করেছে।

তিনজনের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে কথা বলা শেষ। রুটিওয়ালার জন্যে বসে রইল গোয়েন্দারা।

রুটিওলাও এল। ছোটখাট মানুষ। শরীরের তুলনায় উঁচুই বলতে হবে কণ্ঠস্বর। গেটের কাছে ভ্যান রেখে রুটির ঝুড়ি হাতে এগিয়ে এল। ছেলেমেয়েদের দেখে বলল, 'এই যে, কেমন আছ, মুসা? ফারিহা কেমন? রবিনও আছ। তোমাদের রুটি দিয়ে এলাম।'

হাত বাড়াল মুসা, 'দিন ঝুড়িটা, আমিই দিয়ে আসি।'

ঝুড়ি দিল না ডুডিল। ভয় পাওয়ার ভান করে রসিকতা করল, 'না না, কখন আবার চুরি হয়ে যায়। চোরেরও খিদে লাগে। আজকাল ওদের যা উৎপাত বেড়েছে। কাল মিসেস মারগটের বাড়িতে কি ঘটেছে শুনেছ তো?'

'শুনেছি, অল্প অল্প,' বলল রবিন। রুটিওয়ালাই চোরের ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ করে দিল বলে খুশি হলো। কথা আদায়ের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল, 'আসলে কি ঘটেছিল, বলুন তো?'

'আমিও তেমন কিছু জানি না,' ডুডিল বলল। 'রোজ যে সময় যাই, কালও সে-সময় গিয়েছিলাম। দরজায় টোকাও দিলাম না, ঘণ্টাও বাজালাম না। জানি এই দিন ছুটি থাকে রাঁধুনীর। রান্নাঘরের দরজা খোলা থাকে। ঘরে ঢুকে দেখলাম টেবিলে মুদি দোকানের মালপত্র। দরজার পাশে চিঠির প্যাকেট। বুঝলাম আমার আগেই এসে জিনিস রেখে গেছে মুদির মেয়ে আর ডাকপিয়ন।'

ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাল সে, ওদের আগ্রহ বোঝার চেষ্টা করল। 'রাঁধুনী না থাকলে একটা কাগজে লিখে রেখে যায় ক'টা রুটি লাগবে। দেখলাম চারটে দিতে বলেছে। টেবিলে চারটে রুটি রেখে বেরিয়ে এলাম।'

'চোরের সাড়াশব্দ পাননি?' কিছুটা হতাশ হয়েই জানতে চাইল ফারিহা।

'নাহ্। তবে ফুলের বেডের পাশে বড় বড় পায়ের ছাপ দেখেছি, মনে আছে।'

'আপনিও দেখেছেন!' বলে উঠল মুসা।

অবাক হলো রুটিওয়ালা। 'তোমরাও জানো মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, আমি দেখেছি। বেডের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল বিশালদেহী কোন লোক। রীতিমত একটা দৈত্য। তখন মাথা ঘামাইনি তেমন। ভেবেছি, জানালা কিংবা বাড়িঘর পরিষ্কার করতে এসেছিল কেউ। বেরিয়ে এলাম ওবাড়ি থেকে।'

'তারমানে,' রবিন বলল, 'আপনি যখন ঢুকেছেন, তখনও ভেতরে ছিল লোকটা! ইস্, তখন কোনভাবে টের পেয়ে দোতলায় উঠলেই ধরে ফেলতে পারতেন ওকে।'

'কি জানি!' অনিশ্চিত শোনাল রুটিওয়ালার কণ্ঠ। 'হবসনদের বাড়িতে তো ধরার জন্যে ওপরেও গিয়েছিলাম, ধরতে পারলাম কই! বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন চোরটা! চোখের দেখাটাও দেখলাম না একবার!'

'ভূতুড়ে কাণ্ড!' হাত বাড়াল মুসা, 'দিন, ঝুড়িটা, আপনার আর কষ্ট করে যাওয়া লাগবে না। আমিই গিয়ে দিয়ে আসি। যেটা দরকার রেখে দেবে আমাদের রাঁধুনী।'

কিন্তু এবারও ঝুড়ি দিল না রুটিওলা। মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমিই যেতে পারব। ঘাঁটাঘাঁটি করে কোনভাবে ময়লা লাগিয়ে দিলে বদনাম হয়ে যাবে। গ্রীনহিলসে আমিই একমাত্র পরিষ্কার কাপড় দিয়ে রুটি ঢেকে আনি।'

রান্নাঘরের দিকে হেঁটে গেল রুটিওয়ালা। ঝুড়ির ভারে কাত হয়ে গেছে ছোট্ট মানুষটা। সেদিকে তাকিয়ে ফারিহা বলল, 'খুব তো সাফ থাকার দেমাগ দেখাল। রুটি ঢেকে রাখে। হাত এত ময়লা কেন?'

রুটি দিয়ে ফিরে এল ডুডিল। গেটের দিকে এগোতে গিয়ে থামল। ছেলেমেয়েদের বলল, 'আজ আর চুরিদারি হয়নি কোথাও। কড়া নজর রাখছি। পুলিশকে কথা দিয়েছি, সন্দেহজনক কাউকে কারও বাড়িতে ঘুরঘুর করতে দেখলেই খবর দেব। রুটি নিয়ে প্রায় সবার বাড়িতেই যেতে হয়। ঢোকার সুবিধে আছে আমার। দেখারও। ফগের ধারণা আবার কোথাও চুরি করবে চোরটা। সেজন্যে আমাকেই স্পাই নিযুক্ত করেছে।'

শিস দিতে দিতে গেটের দিকে এগিয়ে গেল রুটিওয়ালা।

ভ্যান নিয়ে লোকটা চলে যাওয়ার পর রবিন বলল, 'আমাদের কাজ তো শেষ। বসে বসে করবটা কি?'

'কি করতে চাও?' মুসা বলল, 'অহেতুক বসে থাকতে আমারও ভাল লাগবে না।'

ফারিহা প্রস্তাব দিল, 'নদীর ধারে চলে গেলে কেমন হয়? বেরিংটন ক্রকে কিশোর কি করছে দেখতে পারি।'

ভাল প্রস্তাব। কারোরই অমত নেই।

আট

নদীর কিনার দিয়ে গেছে পথ ; সে পথ ধরে হেঁটে চলল মুসা, ফারিহা আর রবিন।

পথে একটা বাড়ি পড়ল। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়িটা করেছিল এক মস্ত ধনী লোক। পরে বিক্রি করে দিয়ে শহরে চলে গেছে। এখনকার মালিক বাড়িটাকে অনেকটা বোর্ডিং হাউসের মত বানিয়েছে, পেইং গেস্ট রাখে।

নদীতে নৌকা চলছে। গরমের জন্যে বেশি বেরোয়নি, এই দু'একটা। কিনারে বসে আছে অনেক সৌখিন মৎস্য শিকারী। ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে রাজ্য জয় করার জন্যে নেমেছে একেকজন।

ফারিহা বলল, 'কই, কাউকেই তো একটা মাছ ধরতে দেখলাম না এখনও। শুধু শুধু বসে থাকতে ভাল লাগে এদের?'

ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করল একজন শিকারী। ফারিহা কথা বলায় রেগে গেছে।

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এল তিনজনে। হেসে বলল মুসা, 'পায় না কচুটাও। অথচ ভড়ং দেখো। যেন একটু শব্দ করলেই রুই-কাতলাগুলো সব পালিয়ে যাবে।'

এগিয়ে চলল ওরা। খেতে কাজ করছে চাষী। ফিরে তাকানোরও সময় নেই ওদের।

অবশেষে বেরিংটন ব্রুকে পৌঁছল ওরা। ছদ্মবেশী কিশোরের সন্ধানে তাকাল এদিক ওদিক।

প্রথমে কাউকে চোখে পড়ল না। তারপর দেখল, পানির কিনার থেকে সামান্য দূরে নৌকায় কুঁজো হয়ে বসে আছে এক লোক ; ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। পরনে আজব পোশাক। চেক কাপড়ে তৈরি অনেক বড় হ্যাট। গলায় কালচে সবুজ স্কার্ফ। নীল রঙের লম্বা ঝুলওয়ালা আঁটো কোট গায়ে দিয়েছে এই গরমের মধ্যে। পরনে টকটকে লাল রঙের প্যান্ট।

লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

মুসা বলল, 'কিশোর না তো? ছদ্মবেশে আছে?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, কিশোরের শরীর এত বড় না। অন্য কেউ।'

'অ্যাই,' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল মুসা, 'সেই লোকটা না তো!'

কোন লোকের কথা বলছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। সবাই মুখ

চাওয়া-চাওয়ি করল। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল পানির কাছে।

ফিরেও তাকাল না লোকটা। একমনে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন মুহূর্তের জন্যে চোখ সরালেও হাতছাড়া হয়ে যাবে মাছ।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'ভুরু দেখেছ? যেমন পোশাকের ছিরি, তেমনি ভুরু। মুখও একখান। গাল তো এমন ফোলার ফোলা, আরেকটু ফুললে ফেটেই যাবে!'

ওদের কথা নিশ্চয় কানে গেছে লোকটার। তবু ফিরল না। খুক খুক করে কেশে উঠল।

হাঁ হয়ে গেল ফারিহা। উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, ভেড়ার কাশির মত শব্দ!'

লোকটার হাতও দেখতে পেল ওরা। রোমশ। বিশাল থাবা।

মুসার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, এই লোক চোর না হয়ে যায় না। নিশ্চয় টিনাদের আর মিসেস মারগটের বাড়িতে ডাকাতি করেছে এই লোকই!

আসল লোককে পাওয়া গেছে। কিশোরকে খুঁজে বের করতে পারলেই হয় এখন।

এখানে ওখানে বসে মাছ ধরছে আরও কিছু লোক। গরমের মধ্যে গাছের ছায়ায় পিকনিক করতেও এসেছে কেউ কেউ। নদীর ধারে বাতাস চমৎকার। খুব আরাম।

রাস্তায় লোক চলাচল কম। সাইকেলে করে চলে গেল ডাকপিয়ন। তার পর পরই গেল টেলিগ্রাফ বয়। ওদের পর শিস দিতে দিতে ভ্যান চালিয়ে এল রুটিওয়ালা। গোয়েন্দাদের কাছে এসে থামল। 'বাহ্, আবার দেখা হয়ে গেল। শরীর ঠাণ্ডা করতে এসেছ বুঝি? এই দুপুর বেলা সাঁতার কাটতে ভারি মজা। ইস্, তোমাদের মত বয়েস যদি কম হত, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু খালি ঠাণ্ডা লাগে আমার। এখন আর উল্টোপাল্টা কিছু করতে পারি না। কে যে রুটিওয়ালা হতে বলেছিল! কাজ করতে করতেই মরলাম! তার চেয়ে দেখো না, জেলে হলে অনেক ভাল হত। কাজ নেই কর্ম নেই, ফাতনার দিকে তাকিয়ে শুধু বসে থাকা। চাইলে ঘুমিয়েও নিতে পারো যখন তখন।'

বকবকানি শুনে ফিরে তাকাল একজন মৎস্য শিকারী।

হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল ডুডিল, 'মাছ পেলেন?'

নীরবে, শুধু মাথা নাড়ল শিকারী। গোয়েন্দাদের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে আবার ফাতনার দিকে নজর ফেরাল।

বড় একটা গাছের নিচে ইজেলে ছবি আঁকছে এক মহিলা। মুসা বলল, 'নিশ্চয় ও কিশোর! দেখছ না কেমন মোটাসোটা।'

তাড়াতাড়ি মহিলার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মহিলা।

একবার দেখেই ওকে কিশোর নয় বলে নাকচ করে দিল গোয়েন্দারা। মহিলার নাক অনেক বেশি ছোট। কিশোরের অত ছোট নয়। রবারের নাক লাগিয়ে ছোট নাককে বড় করা সম্ভব, কিন্তু বড়টাকে ছোট করা যাবে না। সুতরাং মহিলার কাছ থেকে সরে এল ওরা।

কোথায় আছে কিশোর? কি করে পাওয়া যাবে ওকে?

কি যেন ভাবছিল ফারিহা। হঠাৎ বলে উঠল, 'পেয়েছি! এসো আমার সঙ্গে!'

হনহন করে ফিরে চলল সে, যেদিক থেকে এসেছিল।

'কি পেয়েছ?' জানতে চাইল রবিন।

মুসা ডাকল, 'অ্যাই!'

থামল না ফারিহা। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'চোখ! কুচকুচে কালো চোখের মণি। কিশোর ছাড়া আর কেউ না। সব কিছু লুকালেও ওই চোখ লুকাতে পারবে না!'

নয়

যে মৎস্য শিকারীর সঙ্গে কথা বলেছিল রুটিওয়ালা, তার কাছে ফিরে এল ওরা। সোজা তার কাছে নেমে গিয়ে ফারিহা বলল, 'আর লুকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, কিশোর। আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি।'

চেষ্টা করল না কিশোর। হাসল। জিজ্ঞেস করল, 'কি করে চিনলে?'

'চোখ দেখে।'

'হুঁ। তারমানে ভবিষ্যতে চোখেরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যাই হোক, বলো, কি খবর?'

'লোকটাকে পেয়ে গেছি আমরা, কিশোর!' উত্তেজিত স্বরে বলল মুসা।

'কাকে?'

'সেই লোকটাকে! ডাকাত!'

অবাক হলো কিশোর, 'কোথায়?'

'ওই যে। একা একা নৌকায় বসে মাছ ধরছে। লাল-নীল-সবুজ দিয়ে ঢেকে ফেলেছে শরীর।'

'কি করে বুঝলে?'

'বড় বড় হাত। কাশেও ভেড়ার মত করে। ওই লোক ডাকাতটা না হয়ে যায় না!'

'তাই নাকি?' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'তাহলে তো পুলিশকে জানাতে হয়। এসে ধরে নিয়ে যাক।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেনকে ফোন করব?'

'দরকার নেই। সাধারণ একটা চোর ধরার জন্যে ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনা লাগবে না। ফগকে করলেই যথেষ্ট।'

কিশোরের এই শীতল আচরণ অবাক করল মুসা ও রবিনকে। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। আগ্রহ বোধ করছে না কেন কিশোর? ওরা রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে বলে ঈর্ষা করছে না তো?

'তুমি যাবে না?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না। সবার চলে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি ওর ওপর চোখ রাখছি। উঠে চলে গেলে পিছু নেব।'

যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু ফোন করবে কোথা থেকে?

গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা। পোস্ট অফিস থেকে করবে ঠিক করল।

ফোন করে ফগকে পাওয়া গেল না। তার বাড়িতে কাজ করে যে মহিলা, সে জানাল, সাহেব বাড়ি নেই। কোথায় গেছে বলে যায়নি। তবে নোট লিখে রেখে গেছে সাড়ে চারটে নাগাদ ফিরে আসবে।

ঘড়ি দেখল রবিন। অনেক দেরি এখনও। কি করা যায় এতটা সময়?

খিদে পেয়েছে। স্যাণ্ডউইচ আর আইসক্রীম খাওয়ার প্রস্তাব দিল মুসা।

খুশি হয়েই রাজি হলো অন্য দু'জন।

সাড়ে চারটার পর আবার ফোন করল রবিন। এইবার পাওয়া গেল ফগকে। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেই বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় জানাল, আছে।

কিন্তু চোরের কথা শুনে কিশোরের মতই কোন আগ্রহ দেখাল না ফগ। এতবড় একটা খবর শুনেও তার মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। নীরবে শুনল রবিনের কথা। তারপর একবার বিড়বিড় করে 'ঝামেলা' বলে রিসিভার রেখে দিল।

নদীর ধারে ফিরে যাওয়ার সময় নেই আর। বাড়ি ফিরে চলল তিনজনে।

খানিক পর টিটুকে নিয়ে মুসাদের বাড়িতে হাজির হলো কিশোর। ছদ্মবেশ খুলে রেখে কুকুরটাকে নিয়ে চলে এসেছে। হাসি উপচে পড়ছে চোখে-মুখে।

'কি ব্যাপার?' মুসা বলল, 'চলে এলে যে? চোরটা কোথায়?'

'তোমরা চলে আসার পর পরই মাছ ধরা বাদ দিয়ে সে-ও রওনা হয়ে গেল। সুতরাং আমাকেও উঠে আসতে হলো।'

'ওর পিছু নিয়েছিলে?' জানতে চাইল রবিন। 'কোনদিকে গেল?'

'না, পিছু নিইনি। নেয়ার দরকার ছিল না। কোথায় যাবে জানতাম। হ্যাঁ,

ফগকে ফোন করেছিলে?'

'করেছি।'

সব কথা জানাল রবিন।

মিটিমিটি হাসছে কিশোর।

সন্দেহ হলো রবিনের। 'কি ব্যাপার? হাসছ কেন?'

অন্য দু'জনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হঠাৎ বুঝে ফেলল রবিন। খুব হতাশ হলো। বসে পড়ল একটা বাক্সের ওপর। 'তারমানে...তারমানে আজব ওই লোকটা আমাদের ফগ!'

'বলো কি!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

ফারিহাও অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

কেবল টিটু কিছু বলল না। লেজের ওপর বসে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে।

হাসতে লাগল কিশোর।

'চিনলে কি করে?' রবিনের গলায় ঝাঁজ। বোকা বনেছে যে মেনে নিতে পারছে না। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে।

'চেনার জন্যে চোখ লাগে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ভাল গোয়েন্দারা দেখলেই ছদ্মবেশ বুঝতে পারে। সকালে দেখেই চিনে ফেলেছি। সে-জন্যেই তার কাছাকাছি মাছ ধরতে বসেছিলাম।'

'তাই!'

'ফগকে দেখে বুঝলাম আমাদের মত একই ভাবনা চলেছে ওর মাথায়ও। আমরা বেরিংটনে চোর খুঁজতে গেছি, সে-ও গেছে। এবার বেরোবে রিক খুঁজতে।'

'খুঁজে লাভ হবে? কি মনে হয় তোমার?'

'জানি না। তবে কোন সূত্রকেই অবহেলা করা ঠিক হবে না। ও, একটা ঘটনা ঘটেছিল আজ। নদীর পাড় থেকে আমিও উঠলাম, এই সময় জোরে বাতাস বইল। ছবি আঁকছিল যে মহিলা, তার মাথা থেকে হ্যাটটা উড়ে গেল। তুলে নিয়ে গিয়ে দিলাম। কথায় কথায় জানতে পারলাম বেরিংটন ব্রুকেই থাকে সে। বিশালদেহী একজন মাত্র পুরুষ মানুষ বাস করে ওখানে। কিন্তু সেই লোক এত অসুস্থ, বিছানা থেকেই উঠতে পারে না।'

'ও,' মাথা দোলাল রবিন, 'তাহলে বেরিংটন আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ।'

মুসা জানতে চাইল, 'আচ্ছা, রিকসটা কি, বলো তো?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। বাড়ির নাম, জায়গার নাম, মানুষের নাম। আসল নামের সংক্ষেপও হতে পারে।'

'কি করে বের করব?' ফারিহার প্রশ্ন।

'আচ্ছা,' মুসা বলল, 'টেলিফোন বুকে দেখলে হয় না?'

'ভাল বুদ্ধি,' রবিন বলল। 'আমাদের ঘরে একটা স্ট্রীট ডিরেক্টরিও আছে। তাতে এই এলাকার সব বাড়িঘরের নাম-ঠিকানা আছে। সেটাও দেখতে পারি।'

'তা পারি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'কিন্তু কোন লোকের পা বড়, সেটা জানব কি ভাবে? সবার পায়ের দিকে তাকিয়ে তো আর হাঁটা যাবে না।'

'না। কিংবা বড় পা দেখলেও সোলের নিচটা কেমন, দেখা যাবে না। গিয়ে বলতে পারব না—এই যে, ভাই, দয়া করে জুতোটা একটু ওল্টান, তলাটা দেখি।'

চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা, 'আরেক কাজ করতে পারি! মুচির কাছে যেতে পারি আমরা! জুতোর খবর তার কাছে আছে! জিজ্ঞেস করতে পারি, বারো নম্বর জুতো এই এলাকায় কে পায়ে দেয়!'

ঠিক! ঠিক! ঠিক! একমত হলো সবাই।

দশ

পরদিন সকালের জন্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হলো। স্ট্রীট ডিরেক্টরি ঘাঁটবে রবিন। মুসা আর ফারিহা খুঁজবে টেলিফোন ডিরেক্টরি। কিশোর যাবে মুচির সঙ্গে কথা বলতে।

তার কাজটা সবচেয়ে কঠিন। গাঁয়ে যে মুচি আছে, সে এমনিতেই বদমেজাজী, ছোটদের দেখতে পারে না। প্রশ্ন করতে গেলে খেপে যাওয়া স্বাভাবিক। হয়তো দোকানেই ঢুকতে দেবে না।

ভেবেচিন্তে এক বুদ্ধি বের করল কিশোর। ওয়াটারভিলে একটা জুতোর দোকান দেখেছে, তাতে পুরানো জুতো বিক্রি হয়। একজোড়া জুতো কিনে নিয়ে আসবে। সারাতে যাওয়ার ছুতো করে ঢুকবে মুচির দোকানে।

বাসে করে ওয়াটারভিলে চলে গেল সে। প্রায় নামমাত্র দামে কিনে আনল এগারো নম্বরের একজোড়া জুতো। একটার মাথার কাছে ছেঁড়াও আছে সামান্য। দেখেই কিনেছে কিশোর। এতে মুচির কাছে সারাতে নিয়ে যাওয়ার ছুতোটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে।

ছেলেমানুষের পায়ে এতবড় জুতো দেখলে সন্দেহ হবে মুচির। কিশোরের পা এতবড়, বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাই বুড়ো ভবঘুরের ছদ্মবেশ নিল।

দোকানের পেছনে কাজ করছিল মুচি। কাস্টোমার ভেবে এগিয়ে এল। ভবঘুরেকে দেখে পছন্দ হলো না। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

গলা কাঁপিয়ে জবাব দিল কিশোর, 'জুতোজোড়া দিল একজনে। কিন্তু পায়ে লাগে না, এক সাইজ ছোট। বড় করে দেয়া যাবে?'

কিশোরের জুতোর দিকে তাকাল মুচি। চাঁছাছোলা জবাব দিল, 'না।'

'বড় সাইজের পুরানো জুতো আছে আপনার কাছে? কিনব।'

'এটা কত নম্বর? এগারো? তারমানে বারো লাগবে। নেই।' আনমনে বিড়বিড় করল, 'বাপরে বাপ! মানুষটা দেখা যায় ছোট, জুতো কত্তবড়!'

'কি বললেন?'

'না না, কিছু না!'

শুকনো হাসি হাসল কিশোর। 'আমার জুতো দেখলে সবাই নানা রকম মন্তব্য করে। কি করব, ঈশ্বর দিয়েছেন অতবড় পা! এই এলাকায় নিশ্চয় এতবড় পা আর কারও নেই!'

'আছে। দু'জনের। এক ওই হাঁদা পুলিশম্যানটার–ফগ, আর আছে কর্নেল বেরিলের।'

'ও। তার জুতোর সোল কি রবারের?'

রেগে গেল মুচি। এই কাস্টোমারের কাছ থেকে সে পয়সা পাবে না। না এর জুতো মেরামত করতে পারবে, না কিছু বেচতে পারবে। কঠিন গলায় বলল, 'তাতে আপনার কি? অহেতুক সময় নষ্ট করছেন। আমি আপনার কোন উপকার করতে পারলাম না, সরি।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরল মুচি।

দরজার দিকে এগোতে গিয়ে আচমকা বেদম কাশতে শুরু করল ভবঘুরে। অসুস্থ বুড়ো মানুষের কাশি। কাশতে কাশতে বাঁকা হয়ে গেল, চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে উপদেশ দিল মুচি, 'বিড়ি খাওয়া ছাড়ুন! নইলে সারবে না এই কাশি! মারা পড়বেন!'

কাশির ফাঁকে ফাঁকে জবাব দিল কিশোর, 'মারা তো এখন এমনিতেই পড়ব যে কোন দিন। জীবনটা তো পার করে দিলাম।'

এই সময় দরজায় দেখা দিল আরেকজন লোক। মোটাসোটা, কালো গোঁফ, চোখে কালো চশমা, এবং বিশাল পা। সাদা ফ্লানেলের শার্ট আর প্যান্ট, ঠেলে বেরোনো বিরাট ভুঁড়িতে লাল চওড়া বেল্ট।

'এই মিয়া, সরো! যত্তসব ঝামেলা!' ধাক্কা দিয়ে কিশোরকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

মনে মনে হাসল কিশোর। যত ছদ্মবেশই নিক ফগ, যতদিন এই 'ঝামেলা' বলার মুদ্রাদোষ বন্ধ করতে না পারবে, সহজেই ধরা পড়ে যাবে। দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে। কান পেতে রইল, ফগ কি বলে শোনার জন্যে। সে নিশ্চিত,

ফগও তার মত জুতোর খোঁজেই এসেছে।

ফগের পোশাক দেখে তাকে দামী কাস্টোমার ভাবল মুচি। কিশোরের মত অবহেলা করল না। খাতির করে বলল, 'গুড মর্নিং। কি করতে পারি, বলুন? জুতো সারানো লাগবে? আরি, অনেক বড় জুতো আপনার! বারো নম্বরের কম না!'

ফগ বলল, 'আমার ভাই জুতো দিতে এসেছিল? সে-ও বারো নম্বর জুতো পরে।'

'কি নাম আপনার ভাইয়ের?'

'নামের দরকার কি? জুতো রেখে গেছে কিনা তাই বলুন।'

ফগের আচরণ ভাল লাগল না মুচির। 'না, যায়নি।'

'মনে আছে আপনার?'

'থাকবে না কেন? এতবড় পায়ের কথা কি আর ভোলা যায়?' খোঁচা দিয়ে বলল মুচি। 'এতদিন জানতাম গ্রীনহিলসে মাত্র দু'জন বারো নম্বর জুতো পরে–ফগ…'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' নিজের অজান্তেই শুধরে দিল সে।

এই আরেকটা ভুল। ফগ বড়ই অসাবধান। ছদ্মবেশে থাকার অযোগ্য। দরজার আড়াল থেকে মুচকি হাসল কিশোর।

তবে ভুলটা খেয়াল করল না মুচি। বলল, 'হ্যাঁ, ফগর‍্যাম্পারকট, আর কর্নেল বেরিল। এখন দেখা যায় আরও তিনজন বাড়ল। আপনি, আপনার ভাই, আর সেই ভবঘুরেটা।'

মাথা ঝাঁকাল ফগ, 'একজনকে চিনি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। ভাল লোক। আমার বন্ধু…'

'ওই হাঁদা কোলাব্যাঙটা যে আবার কারও বন্ধু হতে পারে এই প্রথম শুনলাম…' বলেই সতর্ক হয়ে গেল মুচি। চুপ করে গেল। বন্ধুর সামনে বন্ধুর বদনাম করা ঠিক না।

দরজার আড়াল থেকে আরেকটু হলেই হো-হো করে হেসে উঠেছিল কিশোর, অনেক কষ্টে সামলাল।

ফগের লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল। খেঁকিয়ে উঠল, 'ভবঘুরেটা কে, জলদি বলুন! মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে আপনি কোলাব্যাঙ বলেছেন, গিয়ে যদি বলি…'

তাড়াতাড়ি মুচি বলল, 'আসলে গাল আমি দিতে চাইনি। সত্যি কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না।'

আরও রেগে গেল ফগ। আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, 'ঝামেলা!'

'আরি!' মুচি অবাক। 'আপনিও দেখি ঝামেলা ঝামেলা করেন! ফগের সঙ্গে থাকতে থাকতে শিখে ফেলেছেন!'

'দেখো মিয়া, বাজে কথা বলবে না!' সহ্যের সীমা ছাড়াল ফগের। 'জলদি বলো, ভবঘুরেটা কে? তার জুতোর সোল রবারের কিনা?'

এই অভদ্রতা সহ্য করল না মুচিও। সমান তেজে চিৎকার করে জবাব দিল, 'ভদ্রভাবে কথা বলবেন! জেরা করছেন কেন এ ভাবে? কি করে ভাবলেন আপনার প্রশ্নের জবাব দেব আমি? যান, বেরোন এখন! আমার কাজ আছে!'

কিশোর ভাবল, ফেটে পড়বে এবার ফগ। নিজের পরিচয় দিয়ে কথা আদায়ের জন্যে চাপ দেবে মুচিকে। কিন্তু তা করল না সে। শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। পরে কোন একসময় ইউনিফর্ম পরে এসে শিক্ষা দিয়ে যাবে মুচিকে, ভেবে গটমট করে এগোল দরজার দিকে।

দরজার আড়াল থেকে নিঃশব্দে সরে গেল কিশোর। ফগের সামনে পড়া ঠিক হবে না এখন।

এগারো

মুসাদের ছাউনিতে ফিরে এল সে।

মুচি ফগকে কি বলেছে শুনে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল সবাই, বিশেষ করে ফারিহা। তার হাসি আর থামেই না।

যা যা জেনে এসেছে, জানাল কিশোর। শেষে বলল, 'ট্রেনিং দিয়ে এসে ফগ মনে হচ্ছে এবার ভালই এগোচ্ছে। ওর ওপর নজর রাখা দরকার। কিছু জেনে গেলে যাতে আমরাও জানতে পারি। তারপর, তোমাদের কি খবর?'

'আমি ডিরেক্টরিতে পেয়েছি একটা নাম, রিকওয়েজ,' রবিন জানাল। 'মুসারা টেলিফোন ডিরেক্টরিতে দুটো নাম খুঁজে পেয়েছে। একটা রিকনি, আরেকটা রিকারসন। রিকনিরা থাকে পাহাড়ের ওপর একটা বাড়িতে, আর রিকারসন তোমাদের বাড়ির কাছে।'

'হ্যাঁ, চিনি ওদের,' কিশোর বলল। 'সন্দেহ থেকে একেবারেই বাদ দেয়া যায়। মিসেস রিকারসন বুড়ী হয়ে গেছে। একটা মেয়ে আছে তার। ওরা নিশ্চয় চোর নয়। তা ছাড়া মেয়েমানুষের পায়ে এতবড় জুতো লাগবে না।'

মুসা বলল। 'রিকনিদের সঙ্গে কথা বলতে যাব নাকি?'

'তা যেতে পারো। আমি গিয়ে বসে থাকব ফগের বাড়ির ধারে। নজর রাখব। রবিন, তুমি আর ফারিহা রিকওয়েজের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।'

দুপুরের খাওয়ার পর ফগের বাড়ির কাছে এসে লুকিয়ে রইল কিশোর ভবঘুরের ছদ্মবেশে।

বসে আছে তো আছেই, ফগের দেখা নেই। একটিবারের জন্যে জানালা কিংবা দরজায় দেখা গেল না তাকে। বাড়ি আছে তো? নাকি কোথাও বেরিয়েছে?

সে ভাবতে ভাবতেই বেরিয়ে এল ফগ। সাইকেল নিয়ে। গেট দিয়ে বেরিয়েই চড়ে বসল।

বোকা হয়ে গেল কিশোর। তাই তো! সাইকেলের কথা ভাবেনি কেন? আর অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অহেতুক বসে থেকেছে এতক্ষণ। নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে গেল। ফগ কোথায় গেছে জানে না। কখন আসবে তারও ঠিক নেই। আর বসে থাকার কোন মানে নেই। উঠে মুসাদের বাড়ি রওনা হলো।

সেখানে এসে কাউকে পেল না। নিশ্চয় রিকনিদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে মুসারা, ফেরেনি। টিটুকেও বাড়িতে রেখে এসেছে। ছাউনিতে বসে ঝিমানো ছাড়া কিছু করার নেই। বাগানেও বসতে পারবে না। ভবঘুরেকে দেখলে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবেন মিসেস আমান।

ওরা কখন আসবে ঠিক নেই। একা একা অনেকক্ষণ থাকতে হতে পারে তাকে। এই সময় মনে হলো, বসে না থেকে বরং কর্নেল বেরিলের সঙ্গে দেখা করে এলে মন্দ হয় না।

তা-ই করল সে। ছদ্মবেশ খুলে রেখে কর্নেলের সঙ্গে কথা বলতে চলল।

কর্নেলের বাড়ি খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না। বাড়িটা নদীর কাছে। বাগানে বসে থাকতে দেখা গেল এক প্রৌঢ়কে। গোঁফ সব সাদা হয়ে গেছে। মুখ টকটকে লাল : বেশ রাগী মনে হলো।

পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগল কিশোর। পা সত্যি বড় ভদ্রলোকের। মুচি ভুল বলেনি। বিশাল জুতো পায়ে। রবারের সোল। চোরের সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যায়, কিন্তু তাঁকে মোটেও চোরের মত লাগল না। আর এই লোক মানুষের বাড়ি গহনা চুরি করতে যাবে বলেও বিশ্বাস হলো না। কোন কারণ নেই।

কর্নেলের সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। দেখেই সন্দেহের তালিকা থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে দিল।

হতাশ হয়ে চলে আসার জন্যে উঠতে যাবে কিশোর, এই সময় সাইকেলের ঘণ্টা কানে এল। গেটের দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। ফগ ঢুকছে। ওঠা আর হলো না। ও কি করে দেখার জন্যে বসে রইল।

কর্নেলের কাছে গিয়ে ফগ বলল, 'গুড ইভনিং, মিস্টার বেরিল।'

কটমট করে তার দিকে তাকালেন কর্নেল। বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?'

থতমত খেয়ে গেল ফগ। বেরিল এ রকম আচরণ করবেন আশা করেনি। কর্নেলের জুতোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ইয়ে...ঝামেলা!...ইয়ে...' কথা

খুঁজে পাচ্ছে না সে। কোনমতে বলল, 'একজন ভবঘুরেকে বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন, স্যার?'

'মাথা খারাপ নাকি লোকটার! বাড়ি বয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে ভবঘুরে দেখেছি কিনা!' খেঁকিয়ে উঠলেন কর্নেল, 'এই কথা জিজ্ঞেস করার জন্যেই কি আপনি এসেছেন?'

ভড়কে গেল ফগ। বড় বড় হয়ে গেল তার গোল গোল চোখ। বলল, 'না, না, ঝামেলা! স্যার, যদি দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেন...'

'কোন প্রশ্নের জবাব দেব না আমি!' চিৎকার করে উঠলেন বদমেজাজী কর্নেল। 'যান, বেরোন! ভবঘুরের ঠিকাদারি নিয়েছি নাকি আমি! আমার কাছে খোঁজ জানতে চান!'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কারের ভান করল ফগ। 'স্যার...মানে...আপনার জুতো সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করতাম...'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। জোরে হাত নেড়ে বললেন, 'যান, বেরোন! এক্ষুণি! গরমে মাথা গরম হয়ে গেছে, নাকি? মাথায় বরফ দিন গিয়ে! যত্তসব পাগলের কাণ্ডকারখানা!'

ফগের ভয় হলো মেরেই বসবেন কর্নেল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড় কিশোরের। ফগের মাথা আরও খারাপ করে দেয়ার জন্যেই বেরিয়ে এল বেড়ার আড়াল থেকে। ডাক দিল, 'মিস্টার ফগ...'

এত চমকে গেল ফগ, আরেকটু হলে সাইকেল নিয়েই পড়ে যেত। চিৎকার করে শুধরে দিল, 'ফগর‍্যাম্পারকট! তুমি এলে কোত্থেকে! নাহ্, আর পারা যায় না! যেখানে যাই সেখানেই আছে একটা না একটা! নিস্তার আর পাব না! ঝামেলা! এদের অত্যাচারে গাঁ-ছাড়া হতে হবে!'

মুসাদের বাড়িতে ফিরে এসে ফগের এত রাগের কারণ বুঝতে পারল কিশোর। ছাউনিতে বসে আছে মুসা, রবিন আর ফারিহা। কি কাজ করে এসেছে জানাল।

দেখা যাদের সঙ্গে করতে গিয়েছিল, করেছে ঠিকই, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। মুসা জানাল, মিস্টার রিকনি মাঝারি উচ্চতার মানুষ, দশ নম্বর জুতো পায়ে দেয়। বেরোনোর মুখে ফগের সঙ্গে দেখা। সে-ও কথা বলতে গেছে রিকনির সঙ্গে।

রবিন আর ফারিহা গিয়েছিল রিকওয়েজদের বাড়ি। মিসেস রিকওয়েজ বৃদ্ধা। তার একমাত্র ছেলে হেরিং রিকনি বিশালদেহী বটে, তবে পায়ের আকার শরীরের তুলনায় অনেক ছোট। গর্বের সঙ্গে মিসেস রিকওয়েজ জানিয়েছে, তাদের পরিবারের সবারই নাকি হাত-পা ছোট ছোট। এতে গর্ব করার কি হলো, বুঝতে পারেনি ফারিহা। চীনা হলেও না হয় এক কথা ছিল।

যা-ই হোক, ওদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে ফগের। যেখানে যায় সেখানেই গোয়েন্দাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় রেগেমেগে অস্থির হয়েছে ফগ। কিন্তু ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তার।

ওরা বাড়িতে থাকতে থাকতেই রুটিওয়ালা গিয়েছিল রুটি দিতে।

ব্যস, এই পর্যন্তই। কোন সূত্র পায়নি। তদন্তের কোন উন্নতি হয়নি।

বারো

2, Berington আর 1, Ricks-এর মানে বোঝা গেল না; হতে পারে, এগুলো কোন সূত্রই না। সাধারণ ছেঁড়া কাগজ পড়ে ছিল। আসল সূত্র হলো জুতোর ছাপ, দস্তানা পরা হাতের ছাপ, আর গোল সেই দাগটা—যেটাতে বিচিত্র নকশা আঁকা।

রহস্যটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। যেখানে ছিল, সেখানেই রয়েছে এখনও, একটুও এগোয়নি কেস।

পুরানো জুতোর কথা আলোচনা করার সময় রবিন বলল, 'আচ্ছা, মিস টাকির ওখানে একবার গেলে কেমন হয়?'

'মিস টাকিটা আবার কে?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'ডুডিলের বোন। পুরানো জুতো সংগ্রহ করে। সারা বছর ধরে কিনে বেড়ায়, বছরে একবার নিলামে বিক্রি করে। পত্রিকায় দেখলাম, কয়েক দিনের মধ্যেই একটা নিলাম হবে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি গত নিলামের সময় বারো নম্বরের জুতো কে কে কিনেছিল।'

'মনে করতে পারবে এতদিন পর?' মুসার প্রশ্ন।

'পারতে পারে। এতবড় জুতো কমই কেনে লোকে।'

যদিও বুঝতে পারছে ওরা মিস টাকির কাছে গিয়ে খুব একটা সুবিধে হবে না, তবু কোন সূত্রই বাদ দেয়া উচিত নয়, এটা ভেবে যাওয়া ঠিক করল। কিন্তু কে যাবে? রবিনকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলে দিয়েছেন মা। কাজ আছে। মুসারও কাজ। কিশোর বলল, সে-ই যাবে। ফারিহার কাজ নেই। সে ধরল কিশোরকে, সে-ও যাবে।

নিতে আপত্তি নেই কিশোরের। সুতরাং দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

ওদের দেখে খুশি হলো মিস টাকি। আন্দাজেই বলল, 'আরে এসো, এসো! কি জিনিস আছে দেখার জন্যে এখন থেকেই আসতে আরম্ভ করেছ? গুড। মনে হচ্ছে এবার নিলাম জমবে ভাল।'

মনে মনে খুশি হলো কিশোর। মিস টাকি সুবিধে করে দিল ওদের। কি জন্যে

এসেছে, ব্যানয়ে আর বলতে হলো না। জুতো দেখার ছলে কয়েকটা প্রশ্নও করে নিতে পারবে।

জুতো রাখার স্টোররুমে ওদেরকে নিয়ে গেল মিস টাকি। ঘামে ভেজা পুরানো চামড়ার গন্ধে ভারি হয়ে আছে ঘরের বাতাস। গন্ধটা ভাল না মোটেও। সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ফারিহা কিংবা কিশোর। ফারিহাকে জুতো পছন্দ করতে বলল সে। নিলামের দিন কেনার চেষ্টা করবে।

ফারিহা জুতো ঘাঁটতে লাগল।

মিস টাকির সঙ্গে কথা বলতে লাগল কিশোর। প্রচুর কথা বলে মহিলা। ফলে আসল কথায় আসতে বেগ পেতে হলো না মোটেও।

বড় সাইজের জুতোর কথায় আসতে মিস টাকি জানাল, গত নিলামে রবার সোলের একজোড়া জুতো কিনেছেন কর্নেল বেরিল, আরেক জোড়া কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকট।

'আর কেউ কেনেনি? মনে আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, কেনেনি। এতবড় পা সচরাচর দেখা যায় না।' এক মুহূর্ত ভেবে বলল মহিলা, 'আর কেউ কেনেনি, তবে একজোড়া বারো নম্বরের জুতো চুরি গেছে। রবারের সোল ছিল। এত কম দামী জিনিসও চুরি করার প্রয়োজন পড়ে। নিশ্চয় কোন ভবঘুরে-টবঘুরে হবে।'

এইটা একটা খবর বটে! কান খাড়া করল কিশোর। নানা প্রশ্ন করেও চুরি যাওয়া জুতোর ব্যাপারে আর কিছু জানতে পারল না সে।

কথা শেষ। ফারিহাকে চোখ টিপল কিশোর। দুই জোড়া জুতো পছন্দ হয়েছে ফারিহার। সেগুলো দেখিয়ে মিস টাকিকে বলল, 'পারলে রেখে দেবেন।'

'এখনই নিয়ে যাও না। অসুবিধে নেই।'

'না না, এখন না। এখন পয়সা নেই। তা ছাড়া নিলামে কখনও কিছু কিনিনি। কেনার খুব শখ। অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নাকি কিনতে হয়। খুব মজা পাব তখন।'

হাসল মিস টাকি। 'তা ঠিকই বলেছ। খুব উত্তেজনা হয় ক্রেতাদের মধ্যে, দেখেছি। আমারও ভাল লাগে।'

বেরিয়ে আসার সময় ডুডিলের সঙ্গে দেখা। বাইরে থেকে এসেছে। ওদের দেখেই হেসে বলে উঠল, 'বাহ্, গোয়েন্দারা যে। তা কি মনে করে? ডাকাতি রহস্যের কিনারা হলো?'

'হয়ে যাবে,' ফস করে বলে বসল ফারিহা। 'বলা যায় না, আজ রাতের মধ্যেও হয়ে যেতে পারে। কে জুতো চুরি করেছে এটা বের করতে পারলেই হয়...'

'থামো তো তুমি!' গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল

কিশোর।

লজ্জা পেয়ে থেমে গেল ফারিহা।

'রহস্যের কিনারা তাহলে হয়ে যাচ্ছে,' রুটিওয়ালা বলল। 'ভাল। আমার ধারণা দুই বাড়িতে একই লোক ডাকাতি করেছে। কোন দৈত্যের মত বিরাট শরীরের লোক। মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটও তাই মনে করেন। তিনি বললেন, এবার তোমাদের আগেই রহস্যটার কিনারা করে ফেলতে পারবেন, ধরে ফেলবেন চোরটাকে।'

'তাই নাকি! ইনটারেসটিং!' খানিকটা ব্যঙ্গ করেই বলল কিশোর।

তার বলার ভঙ্গি ভাল লাগল না রুটিওয়ালার। আহত স্বরে বলল, 'অত গুমর ভাল না! কয়েকটা রহস্যের সমাধান করে বড় বেশি গুমর হয়ে গেছে তোমাদের, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটও তাই বললেন। এবার ভাঙবেন সেটা।'

রুটিওয়ালা যে রেগে গেছে, বুঝতে পারল কিশোর। অবাক হলো সে। এতটা রাগার মত তো কিছু বলেনি? বলল, 'সরি, আপনাকে রাগানোর জন্যে বলিনি। ফগটা ওরকম বড় বড় কথা বলে তো…'

রাগ গেল না ডুডিলের। 'কোন ভদ্রলোক সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা উচিত না!'

বলে আর দাঁড়াল না সে। ঘরের দিকে চলে গেল।

ফারিহা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কাজটা ভাল হলো না। মাইণ্ড করল লোকটা।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'করলে আর কি করব! আচ্ছা, যেখানে সেখানে ওভাবে কথা ফাঁস করে দাও কেন? জুতোর কথা কেন বলতে গেলে ডুডিলকে? সে যা রেগেছে, আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কথাটা গিয়ে এখন ফগকে না বলে দেয়। তথ্যটা জানা হয়ে যাবে ফগেরও।'

লজ্জিত হয়ে ফারিহা বলল, 'ভুল হয়ে গেছে। আর বলব না।'

তেরো

রুটিওয়ালাকে বড় কথা বলে এসেছে ফারিহা—সেই রাতেই রহস্যের সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে-রাত তো দূরের কথা, পরের দু'দিনেও কিছুই করতে পারল না ওরা। সামান্যতমও এগোতে পারল না। মিস টাকি বলেছে, একজোড়া জুতো চুরি গেছে। কিন্তু কে চুরি করেছে, না জানতে পারলে এই তথ্য দিয়ে কোন কাজ হবে না।

ইতিমধ্যে আকাশ কালো করে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল একসময়। ঘরে বসে থাকা ছাড়া গতি নেই। আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল গোয়েন্দাদের।

তবে তৃতীয় দিন বিকেলে ঘটল নতুন ঘটনা। আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল ওরা। কিশোরদের বাড়িতে চা খেতে এসেছে মুসা, রবিন আর ফারিহা। আসল উদ্দেশ্য, আড্ডা দেয়া।

বৃষ্টি ধরে এসেছে দুপুরের পর পরই। তবে বাইরে বেরোনোর অবস্থা নেই। কাদা আর পানি জমে আছে।

ঘরে বসে কেরম খেলছে ওরা, এই সময় তুমুল চেঁচামেচি শুরু করল টিটু। কেবলই বেরিয়ে যেতে চাইছে।

প্রথমে গুরুত্ব দিল না কেউ। ভাবল, বেরোতে পারছে না বলে চেঁচাচ্ছে। কিংবা বাগানে এমন কোন জীবের সাড়া পেয়েছে, যাকে সে দেখতে পারে না।

বেরোতে দিল না কিশোর। ধমক-ধামক দিয়ে আটকে রাখল। তবে কিছুতেই যখন থামল না টিটু, দেখতে যাবার সিদ্ধান্ত নিল সে। টিটুকে নিয়ে বেরোল। অন্যরাও বেরোল ওদের পেছনে।

সোজা কিশোরদের বাগানের কোণের ছাউনিতে ছুটল টিটু। ইদানীং ঘরটা পরিষ্কার করে, বড় একটা বাক্স নিয়ে গিয়ে তাতে ছদ্মবেশের কাজে লাগে এ ধরনের ব্যক্তিগত কিছু জিনিস রেখেছে কিশোর। টিটুর পিছে পিছে গিয়ে দেখে ছাউনির দরজা খোলা। ভেতরে উঁকি দিয়েই চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। বাক্সের ডালা পুরোটাই তুলে রাখা হয়েছে। ভেতরের জিনিসপত্র সব মেঝেতে ছড়ানো।

চোর নাকি! হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সবাই।

'কি নিল দেখো তো!' মুসা বলল।

দেখল কিশোর। মাথা নেড়ে বলল, 'তেমন কিছু রাখি না এখানে। নেবে আর কি। পুরানো আমলের রূপার একটা ছুরি নিয়েছে। আর একটা ল্যাম্প। দেখতে রূপার মত, আসলে রূপা নয়, অন্য ধাতু। ঠকা খেয়েছে চোরটা।'

শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দার বাড়িতেই দিনে-দুপুরে ডাকাতি! দুঃসাহস বটে চোরটার! শুরু হলো সূত্র খোঁজা। সেই দানবটাই চুরি করেছে। ঘরের ভেতর পাওয়া গেল তার দস্তানা পরা বিশাল হাতের ছাপ, বাইরে বাগানে পায়ের ছাপ। একটা ঝোপের গোড়ায় সেই বিচিত্র গোল দাগটাও আবিষ্কার করল রবিন।

আফসোস করে মুসা বলল, 'ইস্, টিটু ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি বেরোতাম, দেখতে পেতাম চোরটাকে! অপরিচিত লোক বলেই চিৎকার করেছে।'

'কারও গন্ধ অপছন্দ হলেও সে চিৎকার করে,' কিশোর বলল।

'ওই একই লোক,' রবিন বলল। 'টিনা আর মিসেস মারগটের বাড়িতে যে চুরি করেছে।'

'আমরা কিন্তু ভেড়ার কাশি শুনলাম না!' ফারিহা বলল।

মেঘলা দিন হঠাৎ করে ভূতের ভয় ঢুকিয়ে দিল মুসার মনে। 'অ্যাই, কিশোর, চোরটা আসলে ভূত না তো! কখনও দৈত্য সেজে, কখনও ভেড়া সেজে চুরি করে!'

'হুঁ, কাজ পেল না তো আর! ভূত এসেছে মহিলাদের গহনা আর আমার ছুরি চুরি করার জন্যে! কি কাজে লাগবে তার?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল মুসা। তবে ভয়টা গেল না তার। বার বার এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

চুরির খবর ফগকে জানাবে না ওরা, ঠিক করল।

দুপুরের পর কে কে বাড়িতে ঢুকেছে, মেরিচাচীর কাছে খোঁজ নিল কিশোর। ওরা ভেতরের ঘরে বসেছিল বলে কিছু দেখতে পায়নি। মুদি, দুধওয়ালা আর রুটিওয়ালা এসেছিল। আর কেউ না।

দুপুরের পর বেশির ভাগ সময়ই রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন মেরিচাচী।

রান্নাঘরের বাইরেও সেই গোল দাগ আবিষ্কার করল কিশোর। নিশ্চয় জানালার কাছে এসেছিল চোরটা, উঁকি দিয়ে দেখার জন্যে, কেউ তাকিয়ে আছে কিনা। নেই দেখে নিশ্চিন্তে ছাউনিতে গিয়ে ঢুকেছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে, কিসের দাগ এটা?

মুসা বলল, 'দাগটা আরও কোনখানে দেখেছি আমি। কোথায়, মনে করতে পারছি না।'

'পারলে ভাল হত। এটা একটা জরুরী সূত্র, সন্দেহ নেই,' কিশোর বলল।

'যে তিনজন আজ এসেছিল ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'হয়তো কিছু চোখে পড়ে থাকতে পারে ওদের।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'লাভ হবে না। চোর কি আর ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে আসবে?'

চোদ্দ

এই ঘটনার পর আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করল না কারও। বৃষ্টিও নেই। হাঁটতে বেরোল। নদীর ধারটায় ঘুরে আসবে। সবে বৃষ্টি ছেড়েছে। এ সময় মাছে খাবে ভাল। নিশ্চয় অনেক লোক গেছে মাছ ধরতে। মাছ ধরা দেখতে চলল ওরা।

গেট থেকে বেরোতেই ফগের সঙ্গে দেখা।

মুসা বলল, 'ওই দেখো, ঝামেলা আসছে! চুরির খবর পেয়ে গেল নাকি?'

সন্দেহ কিশোরেরও হলো। কিন্তু কি করে জানবে ফগ?

কাছে এসে দাঁড়াল ফগ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেহ্ হেহ্ করে হাসল কিশোরের দিকে তাকিয়ে। বলল, 'তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। চুরি হয়েছে জানল কি করে লোকটা?

না, চুরি হয়েছে জানেনি। পকেট থেকে নোটবুক বের করল ফগ। তার ভেতর থেকে বের করল একটুকরো কাগজ। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পড়ো।'

চারটে শব্দ লেখা রয়েছে কাগজটায়:

এরপর পাশাদের পালা। দৈত্য।

কিশোরের চারপাশ থেকে ঘিরে এসে অন্যরাও দেখল লেখাটা। মানে কি এর? কোন ধরনের সাবধান বাণী?

ওদের হতবাক করে দিতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে ফগ। বলল, 'চমৎকার নাম নিয়েছে চোরটা, তাই না? দৈত্য। নিজের শরীরের সঙ্গে মানিয়েই নামটা রেখেছে। কি বুঝলে? এরপর তোমাদের বাড়িতে ডাকাতি করতে যাবে।'

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'লয়েড যে কাগজের টুকরো দুটো পেয়েছিল, সেগুলো সঙ্গে আছে আপনার?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করল ফগ। 'হাতের লেখায় মিল আছে নাকি দেখবে? দেখে ফেলেছি। মিল নেই।'

'ভাল করে দেখেছেন?'

'ঝামেলা! গাধা মনে করো নাকি আমাকে? দেখেছি ভাল করেই। মিল থাকলেও পাওয়া যাবে না। কারণ দুটোতে দুই ভাবে লেখা। এটা বড় হাতের অক্ষর, ওগুলোতে ছোট হাতের।'

'আমি লেখার মিল দেখতে চাই না। একই কাগজ কিনা দেখব।'

এই কথাটা ভাবেনি ফগ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল। নোটবুকের কভারের ভেতর থেকে বের করল ওই দুটো কাগজ। দেখা গেল একই কাগজ। একই নোটবুক থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ফগ। মনে মনে রাগ হলো নিজের ওপর। এই ছেলেটার সঙ্গে পারে না কেন সে? সব সময় একধাপ এগিয়ে থাকে ছেলেটা! কাগজগুলো আবার নোটবুকে ভরে রাখতে রাখতে এই প্রথম সত্যি-কথাটা স্বীকার করল, 'এটা অবশ্য দেখার কথা মনে হয়নি আমার। দেখলে তো। কি বুঝলে? আজ রাতে সাবধানে থেকো। এরপর তোমাদের বাড়িতে চুরি করতে যাবে লিখেছে। যাই হোক, ভয় পেয়ো না। আজ রাতে কয়েকবার করে চক্কর দেব তোমাদের বাড়ির চারপাশে। এটা আমার একান্ত দায়িত্ব।'

আপাতত কিশোরকে সাবধান করার একান্ত দায়িত্বটুকু পালন করেই চলে

গেল ফগ। বলে গেছে রাতে আবার আসবে। তবে সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কিশোরের। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে।

'কিছু করতে হবে, কিশোর?' জানতে চাইল রবিন।

'উঁ!' অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল কিশোর। 'কেমন অদ্ভুত, তাই না? এ কাজ করতে গেল কেন চোরটা? নোটটা ফগকে পাঠাল কাজ শেষ করার পর। মাথায় ঢুকছে না কিছু!'

'কখন পেয়েছে বলতে শুনলাম না তো? তুমি শুনেছ?'

'না। কাগজগুলো সব এক রকম, দেখলেই তো–ওটা নিয়ে এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করার কথা মনে ছিল না। তারমানে ওর কাছে আবার যেতে হবে। তাকে দাম দিচ্ছি দেখলে খুশি হবে ফগ। তেলানো পছন্দ করে সে।'

'কখন যাবে?'

'এখনই যাব। নাম দিয়েছে বটে একখান, দৈত্য। সবার চোখ এড়িয়ে দিনের বেলা কি করে বাড়িতে ঢোকে, কাজ সেরে চলে যায়, এটা একটা বিস্ময়।'

'ওই যে বললাম, ভূত,' মুসা বলল, 'আমার কথা তো বিশ্বাস করো না। অদৃশ্য হয় কি করে নাহলে?'

সবাইকে বাড়ি চলে যেতে বলে ফগের বাড়ির দিকে রওনা হলো কিশোর।

ফগ তখন আয়নার সামনে বসে ছদ্মবেশ প্র্যাকটিস করছে। নাকের নিচে ইয়া বড় এক ঝোলা গোঁফ লাগিয়ে দেখছে আর নিজে নিজেই হাসছে। দরজায় টোকা পড়তে কে এসেছে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। কিশোরকে দেখে হাসল। সরে এসে বড় একটা হ্যাট মাথায় বসিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল। ভারি খড়খড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঝামেলা! কি চাই?'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কিশোর। 'ঝামেলা' না বললে হয়তো চিনতে সামান্য দেরি হত। কিন্তু মুদ্রাদোষের কথা মনেই থাকে না ফগের।

চিনেও না চেনার ভান করল কিশোর। ওকে ফাঁকি দিতে পেরেছে ভেবে ফগ যদি খানিকটা মজা পায় তো পাক। 'গুড ইভনিং,' বলল সে, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট বাড়ি আছেন?'

'আছেন। ব্যস্ত।' ঝোলা গোঁফ ওপরে-নিচে নাচাল ফগ।

'কিন্তু আমার যে জরুরী কথা ছিল?'

'দেখি, তাঁকে বলে, দেখা করতে রাজি হন কিনা,' সরে গেল ফগ। কিশোর চিনতে পারেনি ভেবে মহা আনন্দিত। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। যাক, এই একটিবার অন্তত ঠকানো গেল ত্যাঁদড় ছেলেটাকে। গোঁফ আর হ্যাট খুলে রেখে মিনিটখানেক পর দরজা খুলে দিল। কটমট করে তাকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ভুরু নাচিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, কি ব্যাপার?

বিনয়ের অবতার সেজে গেল কিশোর। 'গুড ইভনিং, মিস্টার

ফগর‍্যাম্পারকট। আপনার বন্ধুটি কে?'

'ঝামেলা! তোমার জানার দরকার নেই। তুমি কি জন্যে এসেছ সে-কথা বলো।'

'নোটটা কোথায় পেলেন জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হলো, জানাটা জরুরী, মূল্যবান সূত্র হতে পারে। তাই জানতে এলাম।'

'অফিসে বসে কয়েকটা জরুরী কাগজ দেখছিলাম। ডুবে গিয়েছিলাম কাজে। জানোই তো গ্রীনহিলসে কত কাজ।' ভঙ্গি দেখে মনে হলো ফগ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, কাজের জ্বালায় অস্থির, দম ফেলার ফুরসত নেই। 'দুধওয়ালা আর রুটিওয়ালা এসে আমি ব্যস্ত দেখে ডাকল না আর। রান্নাঘরের টেবিলে দুধের বোতল আর রুটি রেখে চলে গেল। রান্নাঘরে ঢুকলাম চা খাওয়ার জন্যে। দুধের বোতলটা তুলতেই তার নিচে দেখলাম কাগজটা। বোতল দিয়ে চাপা দেয়া ছিল।'

'হুঁ। তারমানে ঠিক কখন রেখেছে কাগজটা জানেন না। তবে দুধওয়ালা আর রুটিওয়ালা এসে চলে যাওয়ার পর কোন সময় এসেছে চোর। ওরা যে এসেছিল সাড়াশব্দ পেয়েছিলেন?'

সারাটা দুপুর ঘুমিয়েছে ফগ, পাবে কি করে। তবে সে-কথা বলল না কিশোরকে। 'নাহ্। বললামই তো, কাজে এত ডুবে গিয়েছিলাম দুনিয়ার কোন খবরই ছিল না। কাজের সময় খবর থাকেও না আমার। মনে হয় সময় মতই এসেছিল ওরা, অন্য দিন যেমন আসে—আড়াইটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

বুঝতে পারল কিশোর, ফগ ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাঁয়ের একজন সাধারণ পুলিশম্যান, অফিসে তার আর কি কাজ। সে-কথা মনে করাতে গেল না। বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। সাবধান করে দিতে গেছেন আমাদের, সে-জন্যেও ধন্যবাদ। তবে ভয় পাই না। রাতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাব। পাহারা দেয়ার জন্যে, একান্ত দায়িত্ব সারার জন্যে আপনিই তো আছেন। চলি। গুড বাই।'

চোখের পাতা কুঁচকে চোখ ছোট ছোট করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ফগ, খুশি হবে কিনা বুঝতে পারছে না। ছেলেটা কি তাকে সত্যি সত্যি প্রশংসা করে গেল, নাকি ব্যঙ্গ?

পনেরো

রাতে কয়েকবার করে যে একান্ত দায়িত্ব পালন করতে এল ফগ, সেটা সবার আগে টের পেল টিটু, বিছানার নিচে শুয়ে বার বার ঘেউ ঘেউ করে সে-খবর

কিশোরকেও জানিয়ে দিল। তবে চোর আর এল না। আসবে কি? যা কাজ সারার সে তো দিনের বেলাতেই সেরে গেছে।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে গম্ভীর হয়ে রইল কিশোর।

তাকে চিন্তিত দেখে মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কি হয়েছে? শরীর খারাপ?'

'নাহ্!'

'তারমানে আবার কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস?'

জবাব দিল না কিশোর। চুপচাপ খেতে লাগল। রহস্যটার সমাধান করতে পারছে না বলে, কোন উপায় দেখছে না বলে রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। ঘামাতে ঘামাতে গরম করে ফেলেছে মাথাটা, কিন্তু তাতেও কোন কাজ হচ্ছে না।

মেরিচাচী বললেন, 'চুল কেটে আয় গিয়ে আজ। এত বড় বড় চুল হয়েছে, মোষের মত দেখাচ্ছে!'

'মোষের চুল থাকে না, চাচী,' শান্তকণ্ঠে জানিয়ে দিল কিশোর।

'থাক আর না থাক, তোকে মোষের মত লাগছে! খেয়ে গিয়ে চুল কেটে আয়।'

ঝগড়া বাধানোর মানসিকতা নেই এখন কিশোরের। চাচীকে শান্ত করার জন্যে বলল, 'আচ্ছা, যাব।'

নাস্তা শেষে টিটুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। চুল কাটাতে তার সাংঘাতিক বিরক্ত লাগে। নাপিতের হাতে মাথার ভার ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা। নাপিত তার ইচ্ছেমত চুল টানবে, কান টানবে, মাথা চেপে ধরে একবার এদিকে কাত করবে, একবার ওদিকে, এ সব সইতে পারে না সে। মেরিচাচী চাপাচাপি না করলে জীবনেও চুল কাটত না।

নাপিতের দোকানে বসে টিটুকে চুপ করে বসে থাকতে বলে চেয়ারে বসল সে।

চুলে কাঁচি চালাতে লাগল নাপিত।

বেকায়দা ভঙ্গিতে মাথাটা বাঁকা করে রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চুরির রহস্যটার কথা ভাবতে লাগল কিশোর।

বছর ছয়েকের একটা ছেলে আছে নাপিতের। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে হেঁটে আসতে লাগল। আনমনে তাকিয়ে রইল কিশোর। অমন করে হাঁটছে কেন ছেলেটা? পায়ের দিকে চোখ পড়তে কারণটা বোঝা গেল। নিজের পায়ের চেয়ে অনেক বড় জুতো পরেছে ছেলেটা। বোধহয় বাপের জুতো। নিজেরগুলো খুঁজে পায়নি; বাগানে আর রাস্তায় পানি বলে খালি পায়ে বেরোনোর সাহস পায়নি বোধহয়।

জুতো পায়ে দোকানে ঢুকল ছেলেটা। মেঝেতে ছাপ পড়ল। সেদিকে চোখ

পড়তে স্থির হয়ে গেল কিশোর। আনমনা ভাবটা চলে গেল পলকে। ঝট করে সোজা হলো। কাঁচির খোঁচা খেয়ে উফ্ করে উঠল।

ঠিক হয়ে বসতে বলল তাকে নাপিত।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। জবাব পেয়ে গেছে কিশোর। চুল পুরো কাটা হয়নি। আধখাপচা হয়ে আছে। সেই অবস্থায়ই লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে টিটুকে বলল, 'আয় টিটু!'

বলেই ছুটে বেরোল সে।

পেছনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল নাপিত।

তার ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটা অমন করে পালাল কেন, বাবা? চুল কাটতে ভাল লাগে না নিশ্চয়?'

'তোর মত নাকি সবাই!'

'তাহলে পালাল কেন?'

কি জানি! মাথায় দোষ আছে হয়তো!'

মুসাদের বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল কিশোর। তার দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল পথচারীরা।

ছাউনিতে সবাই অপেক্ষা করছে। তার দেরি দেখে অস্থির। ওই অবস্থায় তাকে ঢুকতে দেখে হাঁ হয়ে গেল।

সবার আগে হাসল মুসা। হো হো করে হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'এই অবস্থা কেন তোমার! ভূতে তাড়া করেছে?'

কানেই তুলল না কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'শোনো, রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি!'

'মানে!'

'করে ফেলেছ!'

'কি ভাবে!'

এক ঝাঁক প্রশ্ন ছুঁড়ে মারা হলো কিশোরের দিকে।

একটা বাক্সের ওপর বসে বলল কিশোর, 'চুল কাটতে গিয়েছিলাম। সমাধানটা করে দিয়েছে নাপিতের ছেলে।'

বলে কি! আরও অবাক সবাই কিশোরের কথা কিছু বুঝতে পারল না।

কিশোর বলল, 'ওই দৈত্যের মত পা-ই আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আসল লোকটার পা খুবই ছোট।'

সবাই আরও অবাক। কি বলতে চায় কিশোর?

'উফ্, আমরা হলাম গিয়ে একেকটা গাধা! চোরটার সহজ চালাকি ধরতে পারলাম না!' বলে নিজেকে গাধামির শাস্তি দেয়ার জন্যেই যেন চটাস করে এক চড় মারল উরুতে। 'চোরটার পা-ও ছোট, হাতও ছোট।'

'তাহলে এতবড় ছাপ পড়ল কি করে?'

'পড়ানো হয়েছে। নাপিতের দোকানে কি দেখলাম জানো? ওর ছেলে নিজের জুতো খুঁজে না পেয়ে বাপের অনেক বড় জুতো পায়ে দিয়ে দোকানে এসে ঢুকল। জুতোর তলায় কাদা-পানি লেগেছিল। ছাপ পড়ল মেঝেতে। তার নিজের পায়ের তুলনায় অনেক বড় বড় ছাপ।'

এইবার বুঝে ফেলল তিনজনেই।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'তারমানে বড় বড় জুতো আর দস্তানা পরে চুরি করতে এসেছিল ছোট শরীরের কোন মানুষ!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ঠিক তাই। বড় শরীরের মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি আমরা, আসল লোকটা চোখ এড়িয়ে গেছে সব সময়।'

'কে করেছে কাজটা, বুঝতে পেরেছ?'

'মনে হয় পেরেছি।'

'কে!' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল অন্য তিনজন।

কিশোর বলল, 'আস্তে আস্তে তোমরাও বুঝে যাবে। কি কি সূত্র পেয়েছিলাম আমরা, মনে আছে? জুতো আর হাতের ছাপ ছাড়াও ছেঁড়া কাগজের টুকরো, গোল বিচিত্র দাগ, এ সব। এখন যেহেতু জানি চোরটার ছোট শরীর, জানি, অতবড় জুতো পরে লোকের চোখ এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না তার জন্যে। ওগুলো অন্য কোন ভাবে বহন করতে হয়েছে, চোরাই মালও লোকের চোখ এড়িয়ে সরানোর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন পড়েছে তার।'

'কে সেই লোক, কিশোর?' এ ভাবে ঝুলে থাকা আর সহ্য করতে পারছে না ফারিহা।

'অত অস্থির হচ্ছ কেন? যা বলার তো বলেই গেলাম। বাকিটা নিজেরাই ভেবে বার করো। শোনো, আমার এখন বসার সময় নেই, আমি চুল কাটাতে যাচ্ছি। এ ভাবে বাড়ি গেলে আস্ত রাখবে না চাচী। এই অবস্থায় কোন কাজেও বেরোতে পারব না। আড়াইটার সময় আমাদের বাড়িতে চলে আসবে সবাই। চোরটাকে ধরার ব্যবস্থা করব।'

কিশোর নিজে থেকে কিছু না বললে যে জোর করে তার মুখ খোলানো যাবে না, জেনে গেছে ওরা এতদিনে। সুতরাং চাপাচাপি করল না কেউ।

ষোলো

বাড়ি এসে প্রথমেই ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করল কিশোর। জিজ্ঞেস করল,

দুপুর আড়াইটায় ওদের বাড়িতে আসা সম্ভব কিনা।

ক্যাপ্টেনের কৌতূহল হলো। জানতে চাইলেন, 'ডাকাতি রহস্যের সমাধান করে ফেলেছ নাকি?'

'করেছি, স্যার। আসুন, সামনা-সামনি সব বলব। স্যার, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে আসতে বলব? আপনার কথা না বললে আসবে না।'

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'নিশ্চয় বলবে। চোরকে হাজতে নিতে হলে তার আসা লাগবে। ঠিক আছে, আড়াইটার সময় হাজির থাকব তোমাদের বাড়িতে।'

ফগকেও খবর দিল কিশোর।

শুনে তাজ্জব হয়ে গেল ফগ। এবং খুশি হলো না মোটেও। রহস্যের খেলায় আবার তাকে হারাতে চলেছে বিচ্ছু ছেলেটা। এই পরাজয় আর ক্যাপ্টেনের সামনে অপমান আর কতদিন সহ্য করতে হবে? ইস্, মাথাটা কেন যে আরেকটু খোলাসা হয় না!

কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটায় এলেন ক্যাপ্টেন। ফগ এল তারপর। সবার শেষে মুসা, রবিন আর ফারিহা। মুসার জন্যেই দেরি হয়ে গেছে। বেরোনোর আগের মুহূর্তে তার বাথরুম চেপেছিল। গিয়ে ঢুকেছে তো ঢুকেছেই, বেরোনোর আর নাম নেই। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে শেষমেষ তাকে বের করেছে রবিন আর ফারিহা।

'আংকেল আর আন্টি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'চাচা গেছে নদীতে, মাছ ধরতে,' জবাব দিল কিশোর। 'চাচী বাজারে। ওদের কথা থাক, সবাই যখন হাজির,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'এবার আলোচনা শুরু করা যায়।' ফগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, চোরটা কে, বের করে ফেলেছি আমি। সেটা বলতেই ডেকেছি।'

'ঝামেলা!' আনমনে বিড়বিড় করল কেবল ফগ।

'কেসটা বেশ ভুগিয়েছে আমাদের,' বলতে লাগল কিশোর, 'সূত্র খুব অল্পই পেয়েছি। বড় বড় পা আর হাতের ছাপ এমন ভাবে পড়েছিল কারও চোখই এড়ায়নি। দুই টুকরো কাগজ পেয়েছি–একটাতে লেখা 2, Berington আরেকটাতে 1, Ricks. আজব একটা গোল দাগও দেখতে পেয়েছি মাটিতে।

'চোরটাকে আসতে-যেতে কেউ দেখেনি। অথচ ধারণা করা হয়েছিল বিশালদেহী। সবার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ কেউ দেখেনি, এটা হতে পারে না। কিন্তু চুরি যে হয়েছে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রীনহিলসে জানা মতে দু'জন মানুষই সবচেয়ে বড় জুতো পরেন–একজন মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আরেকজন কর্নেল বেরিল।'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল ফগ। নিজের অজান্তেই নিজের বিশাল জুতো পরা পা চেয়ারের নিচে লুকানোর চেষ্টা করল।

'প্রতিটি সূত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'কাগজে লেখা

সূত্র দেখে বেরিংটন ব্রুকে গেছি চোর খুঁজতে। রিক দিয়ে নাম শুরু হয়েছে, এ রকম যে ক'টা পরিবার আছে এই গাঁয়ে, সবার বাড়িতে খোঁজ নিয়েছি, কথা বলেছি। মুচির দোকানে গেছি বড় জুতো কারা পায়ে দেয় জানার জন্যে। অনেক কথাই বলেছে ওরা, কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারেনি। তবে একটা মূল্যবান সূত্র দিয়েছে রুটিওয়ালার বোন মিস টাকি-রবারের সোল লাগানো এক জোড়া বারো নম্বরের জুতো চুরি হয়েছে তার স্টোর থেকে।'

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল ফগ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে। আগ্রহ দেখা দিল চোখে। নিস্পৃহ ভাবটা নেই আর।

'কে চুরি করল?' প্রশ্ন করে নিজেই তার জবাব দিল কিশোর, 'অবশ্যই আমাদের চোরটা। ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্যে। এ সব অনেক আগেই বুঝতে পারতাম, যদি বিশালদেহী লোকের ভাবনা আমাদের মগজকে আচ্ছন্ন করে না রাখত। নাপিতের দোকানে চুল কাটতে গিয়েছিলাম আজ। নাপিতের ছেলেটা আমার মগজ পরিষ্কার করে দিয়েছে। ছোট ছেলে, বাবার বড় জুতো পরে দোকানে ঢুকেছিল।

'চোরটাও এ কাজই করেছে। নাপিতের ছেলে করেছে বাধ্য হয়ে, নিজের জুতো খুঁজে না পেয়ে; আর চোরটা করেছে চালাকি, ধোঁকা দেয়ার জন্যে। আসলে তার শরীর একেবারেই ছোট, বড় বড় জুতো আর দস্তানা পরে ইচ্ছে করে ছাপ রেখে গেছে, পুলিশের নজর অন্য দিকে সরানোর জন্যে।'

কিশোর কি বলতে চায়, আঁচ করে ফেলেছেন ক্যাপ্টেন। 'চমৎকার, কিশোর, ঠিক বলেছ তুমি! এটাই জবাব! হ্যাঁ, বলে যাও তোমার কথা।'

'নাপিতের ছেলে জুতো রহস্যের সমাধান করে দিতেই ভাবলাম কে করতে পারে এই কাজ? লোকের বাড়িতে কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়ে কে ঢুকতে পারে?'

সামনে ঝুঁকে গেল ফগ। ভারি হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। কিশোরের ওপর দৃষ্টি স্থির। এইবার চোরের নাম বলতে যাচ্ছে কিশোর!

কিন্তু বলল না সে। দম নিল। কান পেতে আছে যেন কিছু শোনার অপেক্ষায়।

অন্যরাও কান পাতল। কি শুনতে চায় কিশোর?

গেট খোলার শব্দ হলো। বাগানের পথ ধরে এগিয়ে আসতে লাগল পায়ের শব্দ। রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছে।

'স্যার,' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'চোরের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব এবার। যাই, নিয়ে আসি তাকে।'

সবাইকে বসতে বলে বাগানে বেরিয়ে গেল সে।

ঘর থেকে তার কথা কানে এল সবার, 'কেমন আছেন? একবার এদিকে আসুন, প্লীজ!'

সতেরো

যাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল কিশোর, দেখে ফগের কোলাব্যাঙের চোখ আরও গোল, আরও বড় হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, 'ঝামেলা!' নিজের অজান্তেই চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে গেল শরীর।

হাঁ হয়ে গেছে মুসা, রবিন আর ফারিহা।

ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল টিটু।

ভাবান্তর নেই কেবল দু'জনের—ক্যাপ্টেন, আর কিশোর।

'অ্যাই, সর সর!' টিটুকে ধমক লাগাল কিশোর। 'কাজ করতে দে!'

অবাক হয়ে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল আগন্তুক। রুটিওয়ালা ডুডিল। ক্যাপ্টেনকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। মিনমিন করে কিশোরকে বলল, 'আমাকে এনেছ কেন? অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'বসো,' আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমাকে দরকার আছে আমাদের।'

বসল না ডুডিল। ফগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, কি হয়েছে?'

শক্ত হয়ে চেয়ারে বসে রইল ফগ। জবাব দিল না। রুটিওয়ালা তার বন্ধু, এ কথা ক্যাপ্টেনের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে অস্থির সে।

'ডুডিল,' কিশোর বলল, 'আপনাকে কেন এনেছি বুঝতে পারছেন না? ঝুড়িটা রাখুন।...রেখেছেন। হ্যাঁ, এবার ওপরের কাপড়টা সরান।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডুডিলের মুখ। আস্তে করে কাপড়টা সরাল। ভেতরে সাজানো রুটিগুলোর নিচে আরও একটা কাপড় ছড়ানো।

'রুটিগুলো বের করে টেবিলে রাখুন,' আবার নির্দেশ দিল কিশোর। 'ওই কাপড়টাও তুলুন।'

ভয় পেয়ে গেল ডুডিল। 'কেন? রুটি বের করলে নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষকে ময়লা লাগা রুটি খাওয়াতে পারব না আমি।'

'যা বলছে করো,' কঠিন স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন।

আর আপত্তি করল না ডুডিল। রুটিগুলো বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। নিচের কাপড়টাও তুলল।

ভেতরে তাকাল কিশোর। নিজেই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুড়ির নিচ থেকে বের করে আনল চারটে জিনিস—দুটো বড় বড় জুতো, আর চামড়ার দুটো দস্তানা। টেবিলের একপাশে রাখল।

ধপ করে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ডুডিল। কাঁপতে শুরু করল রীতিমত।

'এগুলো দিয়েই চালাকিটা করত সে,' জুতো আর দস্তানা দেখিয়ে বলল কিশোর। 'চুরি করার পরিকল্পনা করার পর বোনের স্টোর থেকে জুতো চুরি করেছে সে। দস্তানাগুলো কোত্থেকে জোগাড় করেছে জানি না। এগুলো ঝুড়ির মধ্যে নিয়ে বয়ে বেড়াত। সুযোগ পেলেই যাতে চুরিটা সেরে নিতে ব্যবহার করতে পারে।'

একটা জুতো তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনকে তলাটা দেখাল সে। 'আপনিও তো টিনাদের বাড়িতে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন, স্যার। দেখুন, মাটিতে পাওয়া ছাপের সঙ্গে এটার সোলের ছাঁচ মেলে কিনা?'

জুতোটা রেখে ডুডিলের দিকে ফিরল কিশোর। হাত বাড়াল, 'দেখি, আপনার নোটবুকটা বের করুন। যেটাতে কাস্টোমারদের রুটির অর্ডার লিখে রাখেন।'

কাঁপা হাতে বের করে দিল ডুডিল।

ফগের দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনার নোটবুকে কাগজের টুকরো দুটো আছে?'

ফগও বের করে দিল।

নোটবুকের পাতা খুলে কাগজ দুটো তার ওপর রেখে ফগের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখুন তো মেলে কিনা? এক কাগজ কিনা?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলল, 'এই কাগজ দুটোতে যা লেখা আছে তা হলো রুটির অর্ডারের নোট। বেরিংটন বুকের জন্যে দুটো রুটি, আর রিকওয়েজদের জন্যে একটা। রিকওয়েজকে সংক্ষেপে লিখেছে রিকস। ভুলে যাবে মনে করেই হয়তো নোটবুক থেকে পাতা ছিঁড়ে রুটির অর্ডার লিখে ঝুড়িতে রেখে দিয়েছিল ডুডিল। কাপড় নাড়াচাড়ার সময় বাতাস লেগে কিংবা অন্য কোনভাবে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে টিনাদের বাড়িতে ঝোপের ধারে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল কাগজগুলো। দেখতে পায়নি সে।'

'ঝামেলা! রুটির অর্ডার এগুলো, কল্পনাই করতে পারিনি!' নড়েচড়ে বসল ফগ।

'কল্পনা আমিও করতে পারিনি প্রথমে,' কিশোর বলল। 'পরে সূত্রগুলো যখন সব জোড়া লাগতে আরম্ভ করল, বুঝলাম রুটিওয়ালার কাজ, তখন বুঝে ফেললাম।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, টিনাদের বাড়ি থেকে পালাল কি করে সে? ওপরতলা থেকে তো কাউকেই নামতে দেখেনি মিসেস টলমার।'

'অতি সহজে। অথচ তখন আমাদের কাছে কি জটিলই না মনে হয়েছে। বক্সরুমের ছোট জানালাটা দিয়ে বেরিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গিয়েছিল। খানিকটা ওপরে থাকতে হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমেছিল বলে দুপ করে শব্দ হয়েছিল। শুনতে পেয়েছে মিসেস টলমার।'

'তাহলে জানালাটা আবার বন্ধ করল কে? লয়েড আর ক্যাপ্টেন গিয়ে তো বন্ধ দেখেছেন জানালাটা?'

হাসল কিশোর। 'পাইপ বেয়ে নেমে গেল ডুডিল। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা চোরাই মালগুলো জড় করল। ঝুড়ির মধ্যে কাপড়ের নিচে জুতো আর দস্তানার সঙ্গে রেখে দিল। তারপর আবার ভালমানুষ রুটিওয়ালা সেজে এসে দেখা করল মিসেস টলমারের সঙ্গে।

'বাড়িতে চোর ঢুকেছে শুনে বেশ আগ্রহ দেখিয়ে মিসেস টলমারের সঙ্গে ওপরতলায় গেল চোর খুঁজতে। আসলে জানালাটা বন্ধ করতে গিয়েছিল সে। মিসেস টলমারকে ফাঁকি দিয়ে বক্সরুমে ঢুকে জানালা বন্ধ করে আসতে বেগ পেতে হয়নি তার। কি বলেন, ডুডিল?'

মাথা নিচু করে রইল রুটিওয়ালা।

'ঝামেলা!' গর্জে উঠল ফগ, 'নিজেকে খুব চালাক মনে করেছিলে, ডুডিল! সবার চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলে! পারলে?'

এবারও জবাব দিল না ডুডিল। চেয়ারের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে।

বন্ধু সেজে এতবড় ধোঁকা দিয়েছে বলে ডুডিলের ওপর রাগে জ্বলছে ফগ: নোটবুক থেকে সেই টুকরোটাও বের করল, যেটাতে পাশাদের বাড়িতে চুরি করতে যাওয়ার কথা লেখা রয়েছে। নোটবুকের পাতার সঙ্গে মেলে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। নোটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা আমার টেবিলে রেখে এসেছিলে কেন?'

ডুডিল চুপ। মুখ তুলছে না।

জবাবটা দিয়ে দিল কিশোর, 'বেশি চালাকি করতে গিয়েছিল। দুই দুইটা চুরি করে ফেলার পরও যখন দেখল হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ, কিছুই করতে পারছে না, আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল তার। আমাদের বাড়িতে চুরি করল, অনেকটা আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। সেদিন ভার বোনের বাড়িতে ফারিহা কিছু কথা বলে ফেলেছিল, আমিও বলেছিলাম, তাতে আমাদের, বিশেষ করে আমার ওপর রেগে গিয়েছিল সে। আপনার সঙ্গে আমাদের একটা রেষারেষি আছে, জেনে গিয়েছিল। অনুমান করল, আমাদের তদন্তের স্বার্থে চুরির ঘটনা যদি আপনাকে না জানাই আমরা, চেপে যাই, সে-জন্যে আপনাকে আমাদের বাড়িতে পাঠানোর জন্যে নোটটা রেখে এসেছিল আপনার টেবিলে। নোট পেলেই আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন, আর এলে চুরির ঘটনা অজানা থাকবে না, এটা মনে করেছিল সে। কায়দা করে জানানোর চেষ্টা করেছিল। ঠিক বলেছি কিনা জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

চুপ করে রইল ডুডিল। তার মানে ঠিকই বলেছে কিশোর।

'ঝামেলা!' চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে ফগের। 'তোমাদের বাড়িতেও করেছে!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। আপনার রান্নাঘরে নোট রেখে আসার আগেই।'
তিক্ত হয়ে গেল ফগের মন। রাগে কথা বন্ধ হয়ে গেল। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন সামনে না থাকলে এখন মেরে বসত ডুডিলকে।
ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, গোল দাগটা কিসের ছিল বললে না তো?'
'এখনও বুঝতে পারছ না? ঝুড়ির। ভেতরে রুটি ভরা থাকায় ভারি হয়ে যেত। মাটিতে চেপে বসায় দাগ পড়ত।'
'ঠিক!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'এইবার মনে পড়েছে কোথায় দেখেছি এই দাগ! চুরি হওয়ার কিছুদিন আগে আমাদের রান্নাঘরের দরজার বাইরে মাটিতে দেখেছিলাম। নিশ্চয় সেদিন ওখানে ঝুড়ি রেখেছিল ডুডিল। ইস্, কেন যে আরও আগে মনে করতে পারলাম না! তাহলে আরও আগেই সমাধান হয়ে যেত।'
'আগে হোক পরে হোক সমাধানটা তো হয়েছে শেষ পর্যন্ত,' হেসে বললেন ক্যাপ্টেন। 'আরেকটা ধন্যবাদ পাওনা হয়ে গেল তোমাদের।' ডুডিলকে দেখিয়ে বললেন, 'ফগ, একে থানায় নেয়ার ব্যবস্থা করো।'
'ইয়েস, স্যার!' উঠে দাঁড়াল ফগ। 'ঝামেলা!'
ফারিহা বলল, 'এক মিনিট। কিশোর, আরেকটা কথা বুঝতে পারছি না। কাশল কে? ভেড়ার গলার শব্দ?'
কাশি দিয়ে উঠল কিশোর। অবিকল ভেড়ার কাশির মত শব্দ। এতটাই আসল মনে হলো, কিশোর যে করেছে বুঝতেই পারল না টিটু। ভেড়া ঢুকেছে মনে করে গরগর করে বাগানে বেরোনোর দরজার দিকে তাকাতে লাগল।
অবাক হয়ে গেল ফারিহা। 'তুমি ঢুকেছিলে সেদিন! কিন্তু…'
'আরে না না,' হেসে মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমি ঢুকব কখন? আর ঢুকবই বা কেন? আমি তো তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। এটাও ডুডিলের আরেকটা চালাকি ছিল। অদ্ভুত স্বরে কেশে বোকা বানাতে চেয়েছিল মিসেস টলমারকে। মিসেস মারগটকে। ওদের মুখে পুলিশ শুনলে যাতে ধাঁধায় পড়ে যায়। ওরকম করে কাশা যে যায়, প্রমাণ দিয়ে দিলাম। সেদিন মাছ ধরতে গিয়ে মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটও দিয়েছে,' বলে কি প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে আড়চোখে তার দিকে তাকাল কিশোর। ওদের বোকা বানাতে পারেনি বুঝে আরও লাল হয়ে গেল ফগের মুখ।
ব্যাপারটা উপভোগ করল কিশোর। বলল, 'প্রচুর বুদ্ধি আছে ডুডিলের, অভিনয়ের ক্ষমতাও আছে। এ সবকে ভাল কাজে লাগালে অনেক উন্নতি করতে পারত। তা না করে করতে গেল চুরি!'
রুটিওয়ালার জন্যে দুঃখই লাগছে মুসার। 'কি আর করবে, শয়তান ভর করেছিল যে মাথায়!'

***

জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। জিনা আর রাফিয়ানও এসেছে। কিশোরের মামা অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি আরিফুর রহমান চৌধুরীর বাড়ির ড্রইংরুমে আড্ডা দিচ্ছে সবাই মিলে। এমন সময় কলিং বেল বাজল। কান খাড়া করে ফেলল রাফি। কিন্তু চোখ মেলল না। যে এসেছে, নিশ্চয় সে-লোকটা তার পরিচিত। সেজন্যেই সতর্ক হলো না।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর।

ঘরে ঢুকল সেলিম শাহেদ। সঙ্গে এক সুদর্শন কিশোর। তিন গোয়েন্দার সমবয়েসী।

সেলিম পত্রিকার লোক। কিশোরের পরিচিত। হাসিমুখে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই। আমার ফুপাত ভাই, শাহরিয়ার খান কাজল। কাজল, এদেরকে নিশ্চয় চিনতে পারছ?'

'অবশ্যই,' হেসে কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কাজল। 'তুমি কিশোর পাশা।' কিশোরের হাতটা চেপে ধরে রেখেই ফিরে তাকাল। 'তুমি রবিন। আর তুমি মুসা।' জিনার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তুমি জিনা।' তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কুকুরটার দিকে তাকাল। 'কেমন আছিস, রাফি?'

এতক্ষণে চোখ মেলল রাফি। গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, 'খুফ্! খুফ্!' যেন কুকুরের ভাষায় বলতে চাইল, 'ভাল। তা তুমি বাবা ভাল তো?'

ওর ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল সবাই। রবিন আর মুসার সঙ্গে হাত মেলানো শেষে রাফির মাথা চাপড়ে আদর করে দিল কাজল।

সোফায় বসল সে আর সেলিম। সেলিমের হাতে বড় একটা প্যাকেট। সেটা জিনার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার জন্যে।'

অবাক ভঙ্গিতে হাতে নিল জিনা। 'কি?'

'খুলেই দেখো।'

সুদৃশ্য কাগজে মোড়া প্যাকেট। রঙিন সুতো দিয়ে বাঁধা। খুলতে শুরু করল জিনা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

ভেতর থেকে বেরোল চমৎকার একটা ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট। চোখ বড়

বড় হয়ে গেল জিনার। 'আরে, এত সুন্দর! সত্যি আমার জন্যে?'
মিটিমিটি হাসছে কাজল। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। বাবা দিল তোমাকে দেয়ার জন্যে।'
'তোমার বাবা? আমাদের কথা তিনি জানলেন কি করে?'
'তিন গোয়েন্দা পড়ে।'
'মানে?'
'বুঝলে না? আমার মত বাবাও তিন গোয়েন্দা পড়ে। বাবা আমার চেয়ে অনেক বেশি পড়ুয়া। যা পায় গোগ্রাসে গেলে। বড়দের বই না ছোটদের বই–তা নিয়ে বাছবিচার নেই। বই পেলেই হলো।' হাসল কাজল। 'বাবা যখন শুনল, আমি তোমাদের কাছে আসছি, জ্যাকেটটা দিয়ে দিল।'
'তবে একেবারে মুফতে দিয়েছেন ফুপা, তা মনে কোরো না,' হেসে বলল সেলিম। 'তিনি ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসাটা খুব ভাল বোঝেন। কেন দিয়েছেন জানো? কি রে কাজল, বলব?'
'বলো।'
'নাকি তুই বলবি?'
'অত ভণিতা করছ কেন। বলেই ফেলো না। একজন বললেই হলো।'
'একটা রহস্যের সমাধান করে দিতে হবে,' সেলিম বলল তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'রহস্য!'
উত্তেজনা বুঝতে পেরে রাফিও বলল, 'ধুফ্! হাউ-আউ-আউউউ!' বোধহয় বলতে চাইল, 'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আমরা গোয়েন্দা-মানুষ। রহস্যের সমাধান করার জন্যে আমাদেরকে অনুরোধ করতে আসবে লোকে, এটাই তো স্বাভাবিক।'
মৃদুস্বরে তাকে ধমক দিয়ে থামাল জিনা। বলল, 'রাফি, চুপ! মাতব্বরী করিসনে। আগে শুনি কি ব্যাপার।'
'ব্যাপারটা হলো,' সেলিম বলল, 'জয়দেবপুরে কাজলদের একটা মস্তবড় ভেড়ার ফার্ম আছে। জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি জায়গা কিনে নিয়ে সেখানে ফার্ম করেছেন ফুপা। বিদেশী সহযোগিতায়।'
এই সময় ঘরে ঢুকলেন কিশোরের মামী। 'সেলিম, কখন এলে?'
'এই তো, কয়েক মিনিট। আন্টি, ও কাজল। আমার ফুপাত ভাই।'
মিসেস আরিফকে সালাম জানাল কাজল।
'দেখো আন্টি, ওরা আমার জন্যে কি জিনিস নিয়ে এসেছে,' জ্যাকেটটা তুলে দেখাল জিনা।
'খুব সুন্দর তো,' দেখার জন্যে এগিয়ে এলেন মিসেস আরিফ। হাতে নিয়ে

দেখতে লাগলেন।

জ্যাকেটটা কোথা থেকে এসেছে জানানো হলো তাঁকে।

'তোমার বাবার ফার্মে এত সুন্দর জ্যাকেট হয়?' অবাক হলেন মিসেস আরিফ।

'হ্যাঁ,' বিনীত হেসে মাথা ঝাঁকাল কাজল। 'শুধু জ্যাকেট না, ভেড়ার চামড়া থেকে পার্চমেন্টও তৈরি হয় আমাদের কারখানায়।'

'তাই নাকি?' মিসেস আরিফ আরও অবাক। 'বাংলাদেশে যে কেউ পার্চমেন্ট বানায়, জানতাম না তো। কিন্তু আমাদের দেশে কি পার্চমেন্ট চলে?'

'বাবা শখে বানায়। তবে ইদানীং কিছু কিছু চলতে আরম্ভ করেছে। সৌখিন মানুষের তো অভাব নেই। বাবা নিজেও সৌখিন। পার্চমেন্ট সংগ্রহের শখ। পৃথিবীর নানা দেশের তৈরি পার্চমেন্ট আছে বাবার সংগ্রহে। কিছু কিছু আছে অনেক পুরানো। বিদেশী ভাষায় লেখাটেখাও রয়েছে ওগুলোতে। কয়েকটাতে আছে দারুণ দারুণ সব পেইন্টিং।'

'তাই নাকি! দেখতে যেতে হবে তো একদিন,' মিসেস আরিফ বললেন।

'নিশ্চয় যাবেন।'

'আমারও কিন্তু আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছ,' কিশোর বলল।

'গুড। তোমাদেরকে নেয়ার জন্যে আমাকে আর কষ্ট করতে হলো না,' হাসল কাজল। 'বড় গলা করেই বলি, আমাদের কারখানা দেখে নিরাশ হবে না। যাই হোক, রহস্যটার কথা বলি। বাবার একটা পার্চমেন্টের গায়ে চারটা ছোট ছোট চমৎকার পেইন্টিং আছে। জিনিসটা কিনে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি বাবা। কিন্তু তারপর না দিয়ে আর পারল না। রহস্যময় অচেনা একজন লোক জানিয়েছে ছবিগুলোর মধ্যে নাকি একটা বিশেষ মেসেজ রয়েছে। বলেছে, মেসেজের মানে উদ্ধার করা গেলে কয়েকজন মানুষের সুখশান্তি আসবে, একটা পুরানো ভুলের সংশোধন হবে।'

'অদ্ভুত তো!' কিশোরের আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 'তারমানে লোকটা সব জানে। তাহলে এ ভাবে রহস্য করে কথা বলল কেন? সব কথা খুলে বললেই পারত।'

'হয়তো বলতে চেয়েছিল,' কাজল বলল। 'কিন্তু সময় কিংবা সুযোগ পায়নি। আচমকা লাইন কেটে গেছে। কেউ হয়তো বাধা দিয়েছে তাকে। তারপর থেকে ছবিটার পেছনে লাগলাম আমরা। পরিবারের সবাই মিলে ছবিতে দেয়া মেসেজের মানে উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। কোন লাভ হলো না। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলাম না।'

'কিছুই না?'

'কিচ্ছু না।'

'হুঁ!' আগ্রহ চরমে পৌঁছেছে কিশোরের। 'দেখা দরকার! কখন রওনা হচ্ছি?'

সেলিমের দিকে তাকাল কাজল। তার হাসিও এখন তুঙ্গে। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে, 'যখন তোমরা রেডি হবে।'

'আপাতত একাই যাওয়া যাক, কি বলো?' দুই সহকারী আর জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'শুনে মনে হচ্ছে, কাজলদের বাড়ির ওপর নজর আছে কারও। এত লোক আমরা একসঙ্গে গেলে সন্দেহ জাগতে পারে তার। গোড়াতেই গলদ হয়ে যাবে তাহলে।'

'তা কেন হবে? আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের বাড়িতে যেতে পারে না? দরকার হয় একটা পার্টি দিয়ে দেব,' কাজল বলল।

'পরে,' হাত নেড়ে বলল কিশোর। 'আগে আমি যাই তোমার সঙ্গে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ওদেরকে তো নিতেই হবে। নিশ্চয় নিতে পাঠানোর জন্যে লোকের অভাব হবে না তোমাদের।'

'তা তো হবেই না। ঠিক আছে,' ঘাড় কাত করল কাজল। 'যা ভাল বোঝো। আমরা রহস্যের সমাধান হলেই খুশি।'

মিসেস আরিফের দিকে তাকাল কিশোর, 'মামী, কি বলো? যাব?'

কিশোরের কথায় মুচকি হাসলেন মিসেস আরিফ। 'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভটা কি? মানা করলে কি আর শুনবে।'

'করেই দেখো,' হাসল কিশোর।

'উহু, বাবা, আমি তোমার আনন্দে বাধা দিতে রাজি না। রহস্য যখন পেয়ে গেছ, তোমাকে আর এখন ঠেকায় কে! তোমার মামাও পারবে না, আমি জানি।'

'মামা তো সেই যে ভোরবেলা বেরোল, এখনও এল না। এত কি কাজ?'

'জানি না।'

'মামা যদি এসে দেখে আমি নেই, না বলে জয়দেবপুর চলে যাওয়ার জন্যে বকাবকি করে?'

'সে-ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই সামলাব।'

লাফ দিয়ে গিয়ে মামীকে জড়িয়ে ধরল কিশোর। 'এ জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি আমি, মামী।'

কিশোরের কাণ্ড দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সেলিম, কাজল, মুসা আর রবিন।

মামীকে ছেড়ে দিয়ে কাজলের দিকে তাকাল কিশোর। 'তুমি বোসো। আমি রেডি হয়ে আসছি।'

হাতঘড়ি দেখল সেলিম। 'কাজল, তোমার কাজ তো করে দিলাম। হলো তো? আমি এখন যাই। জরুরী কাজ আছে এক জায়গায়। ওখান থেকে অফিসে যেতে হবে।'

'আচ্ছা, যাও,' ঘাড় কাত করল কিশোর। 'দেখা হবে।'
'হ্যাঁ, হবে।'
সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল সেলিম।
মিসেস আরিফ চলে গেলেন রান্নাঘরে।
ওপরতলায় রওনা হলো কিশোর। তাকে অনুসরণ করল মুসা, রবিন ও জিনা। কাজলকে বলল কিশোর, 'তুমি আর এখানে একা একা বসে থেকে কি করবে? চলে এসো আমাদের সঙ্গে।'
চোখ মেলল রাফি। সবাইকে যেতে দেখে তারও একা থাকতে ইচ্ছে করল না। অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে হেলেদুলে রওনা দিল সিঁড়ির দিকে।
ওপরতলায় বেডরুমে ঢুকল কিশোর। ব্যাগ বের করে তাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরতে শুরু করল।
কাজল বলল, 'বেশি কাপড়চোপড় নেয়ার দরকার নেই।'
'না, তা নেবও না,' কিশোর বলল। 'অকারণ বোঝা বইতে আমিও পছন্দ করি না।'
হঠাৎ কান খাড়া করে ফেলল রাফি। একটা মুহূর্ত দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন বোঝার চেষ্টা করল। তারপর দৌড় দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।
জিনা ডাক দিল, 'এই, কি হয়েছে?'
সন্দেহ হলো তার। বেরিয়ে এল বারান্দায়। পেছন পেছন কিশোরও বেরোল। কান পেতে শুনে বলল, 'দরজার শব্দ না?'
বলে একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না কিশোর। দৌড়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। দেখতে পেল বসার ঘর থেকে বেরোনোর সদর দরজাটা হাঁ করে খোলা।
কি মনে হতে সোফার দিকে তাকাল।
নেই!
কাজলের আনা জ্যাকেটটা সোফার ওপরই ফেলে গিয়েছিল জিনা। এখন আর সেটা দেখতে পেল না কিশোর। জিনা ওপরে নিয়ে যায়নি। একটু আগেও এখানেই ছিল।
জিনাও নেমে এসেছে। কিশোরকে সোফার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে-ও তাকাল। চিৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, জ্যাকেটটা তো নেই!'
'নিশ্চয় চোর ঢুকেছিল,' বলেই সদর দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর। ছুটে বেরোল বাইরে। পলকের জন্যে দেখল ড্রাইভওয়ের বাঁক ঘুরে দৌড়ে চলে যাচ্ছে একজন তরুণী মহিলা। গায়ে ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট।
কিশোরের পেছন পেছন রাফিও বেরিয়ে এসেছে। তাকে আদেশ দিল কিশোর, 'রাফি, ধর ওকে!'

বাঘের মত হাঁক ছেড়ে মহিলাকে তাড়া করল রাফি। কিশোর গেল তার পেছন পেছন। একটা সেকেন্ড পাশাপাশি ছুটল দু'জনে। তারপর তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল কুকুরটা।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে মহিলা।

কিশোরও বেরিয়ে এল। মহিলাকে দেখতে পেল। নির্জন রাস্তা ধরে ছুটছে। দৌড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ কাজে অভ্যস্ত। নিয়মিত দৌড়ায়। অ্যাথলেটদের মত। ওদের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছে।

'দৌড়াচ্ছে কি দেখো!' পেছন থেকে বলে উঠল মুসা। 'ধরাই তো মুশকিল!'

গতি বাড়িয়ে কিশোরের পাশে চলে এল সে।

ফিরে তাকাল কিশোর। জিনা, কাজল আর রবিনকেও আসতে দেখল।

'পাকা চোর মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, জ্যাকেটটার কথা ও জানল কি ভাবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'আমি বুঝেছি,' জবাব দিল কাজল। 'পাতলা পলিথিনের ব্যাগে ভরে এনেছি জিনিসটা। আমি বাস থেকে নামার সময় নিশ্চয় চোখে পড়েছে ওর। আমাকে অনুসরণ করে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তা হতে পারে। বাড়ির বাইরে এসে লুকিয়ে ছিল। নিশ্চয় জানালা দিয়ে নজরও রেখেছিল। আমরা ওপরতলায় চলে যেতেই ঘর খালি পেয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু দরজা তো বন্ধ ছিল। ঢুকল কি ভাবে?'

রাফি ততক্ষণে পৌঁছে গেছে মহিলার কাছে। ঠিক এই সময় রাস্তার মাথায় এসে দাঁড়াল একজন টহল পুলিশ। এদিকেই আসছে। তবে বেশ দূরে রয়েছে এখনও মহিলার কাছ থেকে। ওদিক দিয়ে পালাতে পারবে না বুঝে মুহূর্তে মোড় নিয়ে একটা বাড়ির খোলা গেট দিয়ে ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল মহিলা।

কিশোররা গেটের কাছে পৌঁছে আর মহিলাকে দেখতে পেল না। কিন্তু রাফিকে দেখল। ছুটে আসছে ওদের দিকেই। দাঁতে আটকে আছে ছেঁড়া কাপড়ের একটা টুকরো। ফেলছে না সেটা। কামড়ে ধরে রেখেছে।

ওর কাছে গিয়ে দাঁত থেকে কাপড়টা খুলে নিল কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল একটা মুহূর্ত। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'মহিলার কামিজের কাপড়! কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে দেখো। রাফি, দারুণ একটা সূত্র রেখে দিলি যা হোক।'

ঘাউ ঘাউ করে কি যেন বোঝাতে চাইল রাফি।

'কি ব্যাপার? খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যেতে বলছিস?' রাফিকে প্রশ্ন করল জিনা।

বাড়িটার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। নতুন তৈরি হচ্ছে। তবে কোন কারণে কাজ এখন পুরোপুরি বন্ধ। লোকজন কাউকে দেখা গেল না। বাড়ির পেছন দিকে ঝোপঝাড়, গাছপালা প্রচুর। কাটা হয়নি এখনও। তার মনে হলো,

ওরই কোন একটা ঝোপে লুকিয়ে পড়েনি তো মহিলা?

বাড়ির পাশ ঘুরে পেছন দিকে রওনা হলো সে। পেছনে এল তার সঙ্গীরা। একটা পাতাবাহারের ঝাড়ের কাছে এসে দেখল জিনার জ্যাকেটটা মাটিতে পড়ে আছে। ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে ওটার ওপর পড়ল রাফি। রাগে গরগর করতে থাকল।

জ্যাকেটটা তুলে নিল কিশোর। কুকুরটার মাথা চাপড়ে আদর করে দিয়ে বলল, 'রাফি, তোর তুলনা হয় না। মহিলাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছিস। তোকে দেখে এতটাই ভয় পেয়েছে, গা থেকে জ্যাকেটটাও খুলে ফেলে রেখে গেছে, ভেবেছে এটা ফেলে গেলে তুই শান্ত হবি। তারপরেও ছাড়িসনি। কামিজ ছিঁড়ে সূত্র রেখে দিয়েছিস।'

'কিন্তু গেল কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল রবিন। 'বেরোতে তো দেখলাম না। আশেপাশেই কোথাও আছে।'

ঝোপের মধ্যে খুঁজতে শুরু করল ওরা। পাওয়া গেল না মহিলাকে। কোন দিকে গেছে অনুমানের চেষ্টা করল কিশোর। আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে বলল সবাইকে।

একেকজন একেক দিকে খুঁজে এসে সামনের চত্বরে জড় হলো ওরা।

মহিলাকে পাওয়া যায়নি।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'যাকগে, কি আর করা। এত সুন্দর জ্যাকেটটা যে ফেরত পাওয়া গেল, এটাই সান্ত্বনা। তবে সূত্র যখন একটা রয়েছে হাতে, পুলিশকে দিলে তারা হয়তো মহিলাকে ধরার চেষ্টা করতে পারবে।'

হঠাৎ আবার ঘাউ ঘাউ শুরু করে দিল রাফি।

জিনা বলল, 'কি রে, আবার কিছু দেখলি নাকি? গন্ধ পেয়েছিস?'

একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। সাঁ করে একদৌড়ে গেটের বাইরে চলে গেল রাফি।

সবাই দৌড় দিল তার পেছন পেছন।

একটা গাড়ির পেছনে ছুটতে দেখল রাফিকে।

গাড়ির পেছনে ছুটছে কেন? অবাক লাগল গোয়েন্দাদের। ওরাও ছোটা শুরু করল রাফির পেছনে।

গাড়িটার কাছে চলে গেছে রাফি। ডাইনে-বাঁয়ে এমন ভাবে কাটা শুরু করেছে, ভয় পেয়ে গেল জিনা—রাফি না গাড়ির নিচে চলে যায়।

'রাফি! থাম! ফিরে আয়!' চিৎকার করে ডাকল সে।

পাত্তাই দিল না কুকুরটা।

গাড়ির সীটে বসা মহিলার ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। তাকে দেখেই বুঝে গেল কেন রাফি গাড়িটার পিছনে লেগেছে। রাফির ছিঁড়ে নিয়ে আসা কাপড়ের টুকরোটার সঙ্গে মহিলার পোশাকের অবিকল মিল।

ওদেরকে যে তাড়া করা হয়েছে, বুঝে গেছে ড্রাইভার। গতি বাড়িয়ে দিল। আর দৌড়ে লাভ নেই। ধরা যাবে না। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। দূরে চলে যাবার আগেই নম্বর প্লেটের দিকে তাকিয়ে গাড়ির নম্বরটা মুখস্থ করে নিল। রাফিও বুঝল, আর তাড়া করে লাভ নেই। সে-ও ফিরে এল।

'অনেক ধন্যবাদ তোকে, রাফি,' কুকুরটার মাথা চাপড়ে আদর করে দিতে দিতে বলল কিশোর। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে মুসা, রবিন, জিনা ও কাজল।

'চলো, বাড়ি যাই,' কিশোর বলল।

তিন গোয়েন্দার কর্মকাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেছে কাজল। এত দ্রুত এত সূত্র জোগাড় করে ফেলবে ওরা কল্পনাই করেনি সে। লাইসেন্স প্লেটের নম্বরটা কিশোর মুখস্থ করে ফেলেছে শুনে বলল, 'যাক, একটা কাজের কাজই করেছ। পুলিশকে জানালেই গাড়ির মালিককে বের করে ফেলবে ওরা। চোরটাকে ধরা আর কঠিন কিছু হবে না...'

'যতটা সহজ ভাবছ ততটা না-ও হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'কেন?'

'কারণ ওই চোরটা গাড়ির ড্রাইভার না-ও হতে পারে।'

'চুরি করে এনেছে বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। আর তা যদি করে থাকে তাহলে গাড়িটা কোনখানে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। এমনও হতে পারে, ড্রাইভার তার প্যাসেঞ্জারকে চেনেই না। মহিলা হয়তো গাড়িটা ভাড়া করেছে। অনেক প্রাইভেট কারের ড্রাইভার থাকে না, মালিকের অজান্তে ভাড়া খেটে বাড়তি দু'চার পয়সা কামিয়ে নেয়।'

হতাশ মনে হলো কাজলকে। 'অথচ আমি ভেবেছিলাম সহজেই ধরে ফেলা যাবে। যাকগে, আশা ছাড়ছি না। এখনও হয়তো সময় আছে। জলদি চলো, পুলিশকে গিয়ে জানাই।'

দুই

ওদেরকে জটলা করতে দেখে এগিয়ে এল টহল পুলিশের একজন হাবিলদার। কি হয়েছে জানতে চাইল। সব শুনে ওদেরকে থানায় নিয়ে যেতে চাইল সে।

'তোমরা এখানে দাঁড়াও,' সঙ্গীদের বলল কিশোর। 'আমি চট করে গিয়ে চামড়ার জ্যাকেটটা নিয়ে আসি।'

জ্যাকেট নিয়ে ফিরে আসতে সময় লাগল না তার।

হাবিলদারের সঙ্গে থানায় রওনা হলো ওরা।
যেতে যেতে কাজল জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকেট দিয়ে কি করবে?'
'পরনের পোশাক থেকেও সূত্র আবিষ্কার করতে পারে পুলিশ।'
'কিন্তু এটা তো কেউ পরেনি...না না, পরেছিল। ওই মহিলা। কোন্ ধরনের সূত্র বের করতে পারবে বলে তোমার ধারণা?'
'এই যেমন যে পরেছে তার রক্তের গ্রুপ, চামড়ার ধরন, উচ্চতা, ওজন, সে নারী না পুরুষ...এ সব তথ্য অপরাধীকে ধরতে সাহায্য করে।'
'বাপরে! গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে এত কিছু ভাবো!'
'ভাবতে হয়। নইলে তদন্ত এগোয় না।'
কথা বলতে বলতে এগোল ওরা।
এক সময় হাবিলদার বলল, 'ওই যে, থানা।'
তিন গোয়েন্দাকে দেখেই চোখ বড় বড় করে ফেললেন ওসি ইলিয়াসউদ্দিন সাহেব। 'তোমরা! কবে এলে?'
'এই তো, কয়েক দিন,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'আপনাকে এখানে পাব ভাবতেই পারিনি, আঙ্কেল। ভালই হলো।'
'হ্যাঁ, আগের থানা থেকে বদলি হয়ে এসেছি,' জবাব দিলেন ওসি। 'তা তোমরা কি মনে করে?'
'একটা চোরের পেছনে ধাওয়া করেছিল, স্যার,' কিশোরের হয়ে জবাবটা দিল টহল পুলিশের হাবিলদার।
মুচকি হাসলেন ওসি। 'অ, এসেই শুরু করে দিয়েছ। কেসটেস পেলে নাকি?'
'কেস কিনা জানি না, তবে ব্যাপারটা রহস্যময়।'
'বলে ফেলো', ওসির মুখে মিটিমিটি হাসি।
কাজলের পরিচয় দিয়ে কিশোর বলল, 'ওর বাবার ভেড়ার ফার্মে তৈরি এই জ্যাকেটটা জিনাকে উপহার দিতে এনেছে কাজল। এটা রেখে সামান্য সময়ের জন্যে ওপরতলায় গিয়েছিলাম আমরা। ফিরে এসে দেখি নেই।'
ভুরু কুঁচকালেন ওসি। 'তারপর পেলে কি করে?'
'চোরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি।'
ওসি সাহেবকে সব কথা খুলে বলল কিশোর। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোটা দেখাল।
'বাপরে! তোমাদের কুত্তাটাও তো এক সাংঘাতিক গোয়েন্দা!'
কিশোরদেরকে বসিয়ে কোক খাওয়ালেন ওসি। আরও কিছু কথাবার্তা হলো। বললেন, কাপড়ের টুকরোটা একটা বড় সূত্র হতে পারে। গাড়ির নম্বরটা লিখে নিয়ে বললেন, 'আমি এখুনি খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।'
'যদি চোরাই গাড়ি হয়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'তাহলে মহিলাকে ধরা কঠিন হয়ে যাবে। দেখি আগে খোঁজ নিয়ে। পরের কথা পরে। কাপড়ের টুকরোটা থাক। আমাদের পুলিশ ল্যাবরেটরিতে পাঠাব, পরীক্ষা করার জন্যে।'

ওসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে দলবল নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সব কথা শুনলেন কিশোরের-মামা আরিফ সাহেব। চোরটা বাড়ির মধ্যে কি ভাবে ঢুকল, সেটাও এক রহস্য। কেউ কোন ব্যাখ্যা দিতে পারল না। কয়েক সেকেন্ড লিভিং রুমে নীরবতা। কাজলও রয়েছে গোয়েন্দাদের সঙ্গে।

মাটিতে শুয়ে আছে রাফি। দরজা খোলার আলোচনা শুনতে শুনতে কান খাড়া করে ফেলল সে। লাফ দিয়ে উঠে পেছনের দুই পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে গেল। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিল করজোড়ের ভঙ্গিতে।

হেসে ফেলল কাজল। 'দারুণ কুত্তা তো। দেখো, কেমন ভাঁড়ামি করছে।'

জিনা ওকে বলল, এটা ভাঁড়ামি নয়। কোন জরুরী মেসেজ দিতে চাইলে মাঝে মাঝে এ রকম করে ইঙ্গিত দেয় রাফি।

দরজার দিকে ছুটল কুকুরটা। সন্দেহ হলো জিনার; পিছে পিছে গেল সে-ও।

পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল রাফি। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নবটা। মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল।

অবাক হয়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল কাজল। এ রকম বুদ্ধিমান কুকুর জীবনে দেখেনি সে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে জিনা। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও, তোর কাজ! তুইই দরজাটা খুলে রেখে পিসু করতে বাইরে গিয়েছিলি।'

'এবং এই সুযোগে ঢুকে পড়েছিল চোরটা,' জিনার কথার সঙ্গে যোগ করল কিশোর।

সবাইকে ঘিরে কয়েকটা ছোট ছোট লাফ দিয়ে কুকুর-নাচন নাচল রাফি। ঘাউ ঘাউ করে হাঁক ছাড়ল কয়েকবার।

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে তিরস্কার করল কিশোর, 'কাউকে ডাকলেই পারতি। এ ভাবে দরজা খুলে রেখে যাওয়াটা উচিত হয়নি মোটেও।'

লজ্জা পেল রাফি। দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকে গেল লেজটা। করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে।

'থাক থাক, আর কষ্ট পেতে হবে না,' আদর করে দিয়ে বলল কিশোর। 'ওঠ।'

আবার এসে সোফায় বসল সবাই। জয়দেবপুরে কাজলদের ভেড়ার খামারে

যাবার কথা মামাকে জানাল কিশোর। 'প্রথমে আমি যাব। অবশ্য তুমি অনুমতি দিলে। কি বলো, মামা?'

হাসলেন আরিফ সাহেব। 'জয়দেবপুরের জঙ্গলে ভেড়ার খামার, পার্চমেন্টে আঁকা ছবির রহস্য, সমাধান করার লোভ কি তুই ছাড়তে পারবি?'

'তুমি মানা করলে যাব না। তবে না যেতে দিলে খারাপ লাগবে,' কিশোর বলল।

'সত্যি কথাটা যে বলেছিস, সেজন্যে খুশি হলাম। যা। আমার কোন আপত্তি নেই।'

মামার হাতটা ধরে জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'থ্যাংকিউ মামা, থ্যাংকিউ! যাই হোক, প্রথমে আমি যাব। আমি গিয়ে খবর দিলে বাকি সবাই যাবে–মুসা, রবিন, জিনা, সবাই।'

'একটা পার্টি দেব ভাবছি,' কাজল বলল। 'আঙ্কেল, আন্টিকে নিয়ে আপনিও আসুন না। এলে খুব খুশি হব।'

'আমি এখন কথা দিতে পারছি না, বাবা,' আরিফ সাহেব বললেন। 'আমার একটা জরুরী কাজ আছে। তোমার বন্ধুদেরকে নিতে চাইছ নাও। পারলে পরে আমরাও নাহয় আসব। বোসো। আসছি। একটা ফোন করে আসি।'

কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে কাজলকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আচ্ছা, জয়দেবপুরে অসীম দেবনাথ বলে কাউকে চেনো নাকি?'

এমন ভাবে প্রশ্নটা করলেন আরিফ সাহেব, কিছুটা অবাকই হলো কাজল। 'আমি চিনি না। তবে বাবা চিনতে পারে। কেন বলুন তো?'

'না, জয়দেবপুরে জহির আবদুল্লাহ নামে আমার এক বন্ধু আছে তো,' কাজলকে বললেন আরিফ সাহেব। 'তাকে সব কথা বললাম। ছবি রহস্যের কথা শুনে অসীম দেবনাথের সাহায্য নিতে বলল জহির। দেবনাথ নাকি খুব ভাল আর্টিস্ট। জহিরের বিশ্বাস, ছবির মানে বুঝতে দেবনাথ তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আর্টিস্ট যখন, পারারই তো কথা।'

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে কাজলকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে বেরোল তিন গোয়েন্দা। কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনল কিশোর। দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র গোছগাছ করল। দুপুরের খাওয়াটা সারতে তাই দেরি হয়ে গেল। ভাড়াটে ট্যাক্সিতে করে কাজলের সঙ্গে জয়দেবপুরে কাজলদের ভেড়ার খামারে এসে যখন পৌঁছল শীতের বিকেল গড়িয়ে গেছে তখন। দীর্ঘ হচ্ছে গোধূলির ছায়া।

ছয়শো একর জুড়ে তৈরি বিশাল খামার। মূল বাড়িটার দিকে এগোনোর সময় চারদিক দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'দারুণ জায়গা! সত্যি!'

মূল বাড়িটা ছাড়াও আরও প্রচুর বাড়িঘর আর ছাউনি রয়েছে এদিক ওদিক।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন কাজলের বাবা-মা। স্বাগত জানালেন কিশোরকে। কাজলের বাবার নাম শাহমায়ার খান আর মায়ের আসিয়া খানম।

লম্বা, সুদর্শন ভদ্রলোক শাহমায়ার খান। চুলের দুই পাশে সামান্য পাক ধরেছে। কালো চোখের তারা চকচকে উজ্জ্বল।

কাজলের মা ছোটখাট গড়নের, তবে খুব সুন্দরী। মায়ের সঙ্গে কাজলের চেহারার মিল বেশি। গড়নটা পেয়েছে বাবার।

মস্ত বসার ঘরটায় কিশোরকে নিয়ে গেল তারা। ঘরের আসবাবপত্র আর গোছানোর ঢং দেখে কিশোরের মনে হলো এক লাফে প্রায় একশো বছর পেছনে চলে এসেছে। পুরানো ডিজাইনের ভারী ভারী সব আসবাব। সম্ভবত কাজলের দাদার কিংবা আরও আগের আমলের।

কাজলের মা কাজলকে বললেন, 'ঠিকঠাক মত এসেছিস তো? পথে কোন অসুবিধে হয়নি?'

মাথা নাড়ল কাজল, 'না, মা।'

কাজলের বাবা হেসে বললেন, 'যাও, ভেড়াগুলোর সঙ্গে দেখা করে এসো। ওগুলো তো তোমার জন্যে কেঁদেকেটে অস্থির।'

খামারের কাজে বাবাকে সাহায্য করে কাজল। নতুন জন্মানো ভেড়ার বাচ্চাগুলো দেখাশোনার ভার তার ওপর। বিশেষ গোলাঘরের আলাদা খোঁয়াড়ে রাখা হয় বাচ্চাগুলোকে। বড় জানোয়ারের কাছাকাছি রাখলে বিপদ হতে পারে।

বসার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো একটা বাঁধানো ছবির ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। বারো বাই বিশ ইঞ্চি সাইজ।

'এটাই সেই রহস্যময় ছবি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' কাজলের বাবা বললেন। 'আমরা তো চেষ্টা করে করে সারা। দেখো এখন, তুমি কিছু করতে পারো কিনা।'

'না না; এখন না, থাক,' তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন কাজলের আম্মা। 'এসেছ, হাতমুখ ধুয়ে নাস্তাটাস্তা করো। চা খাও। তারপর।'

চা খাওয়া শেষ করে ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। ছবিটা চার ভাগ করা। ওপরের দিকের প্রথম ছবিটা একজন সুন্দরী মহিলার। দ্বিতীয়টা একজন পুরুষের, দর্শকের দিকে পেছন করে আছে। তৃতীয় ছবিটা বেশ নজর কাড়ল কিশোরের—একঝাঁক দেবদূত যেন মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে, কিংবা বলা যায় দেবদূতদের ঘিরে রেখেছে মেঘ। মাঝখানের মূর্তিটা একটা শিশুকে ধরে রেখেছে। শেষ ছবিটাতে রয়েছে একটা দুর্ঘটনার দৃশ্য। একটা বড় লঞ্চ—স্টীমার বলাই ভাল, গুঁতো মারছে একটা নৌকাকে।

কাজল আর তার বাবা এসে দাঁড়ালেন কিশোরের পেছনে।

'কি, ইয়াংম্যান?' জিজ্ঞেস করলেন কাজলের বাবা। 'কিছু বুঝতে পারলে? ছবিটার রহস্য জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি।'

'তেমন কিছু তো বুঝতে পারছি না, আঙ্কেল,' ছবির দিক থেকে চোখ সরাল না কিশোর। 'তবে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ছবিটা যেন কোনও একটা পরিবারের কাহিনী বলতে চাইছে। শুরুতে সুখ ছিল পরিবারটায়, শেষ হয়েছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। আমার মনে হয় দ্বিতীয় আর শেষ ছবিটার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে। সম্ভবত দুর্ঘটনার সময় এই পেছন করে থাকা লোকটার কিছু ঘটেছিল।'

'সেই যোগসূত্রটা কি, তুমি বুঝতে পেরেছ?' জানতে চাইল কাজল।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এ মুহূর্তে অন্তত সামান্যতম ধারণাও নেই আমার। তবে কি বোঝাতে চেয়েছে সময় দিলে আশা করি বের করে ফেলতে পারব। প্রচুর ভাবতে হবে। ও, আঙ্কেল, এখানে অসীম দেবনাথ নামে কাউকে চেনেন? ভদ্রলোক আর্টিস্ট।'

'না। কেন?'

'জয়দেবপুরে মামার এক বন্ধু থাকেন, জহির আবদুল্লাহ। তিনিই দেবনাথের কথা বলেছেন। আর্টিস্ট মানুষ তো, ছবির মানে বোঝার ব্যাপারে হয়তো সহায়তা করতে পারবেন।'

'ভাল বলেছ তো।'

তাড়াতাড়ি ডিরেক্টরি ঘেঁটে অসীম দেবনাথের ফোন নম্বর বের করলেন খান সাহেব। ফোনে পাওয়া গেল না দেবনাথকে। একটা মহিলা কণ্ঠ জানাল, তিনি জয়দেবপুরে নেই। কয়েক দিনের জন্যে বাইরে গেছেন।

'অ,' খান সাহেব বললেন। 'ঠিক আছে, আমি পরে আবার ফোন করব।'

সারাদিন প্রচুর ঘোরাঘুরি হয়েছে। রাত বেশি না করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল কিশোর। পরদিন সকালে উঠে, নাস্তা সেরে প্রথমেই খামার দেখতে বেরোল কাজলের সঙ্গে। নতুন জন্মানো বাচ্চাগুলোকে দেখাতে নিয়ে এল কাজল। খুব সুন্দর। ভাল লাগল কিশোরের।

একটা বাচ্চার ওপর চোখ পড়তে অবাক হয়ে বলল, 'আরি, কালো বাচ্চা! দারুণ সুন্দর তো। কিন্তু এ ভাবে নেতিয়ে পড়ে আছে কেন এটা?'

ভেড়াগুলোর দেখাশোনায় নিয়োজিত যে লোকটা, তার নাম নেহাল মিয়া; কিশোরের কথা শুনে এগিয়ে এল।

'কিছু একটা হইছে এইডার, আমিও বুঝতে পারতাছি,' লোকটা বলল। 'মনে অয় কেউ পারা-টারা মারছে। মাইনষের পায়ের তলে পড়ছে, না গরুর পায়ের তলে বুঝবার পারতাছি না। উটতে পারে না। মনে অয় বাচব না। কসাইখানায়ই পাডাইতে অইব।' কাজলের দিকে তাকাল, 'ভাইজান, দিমু নাকি পাডাইয়া?'

'না, দেখি আগে, কি হয়েছে এটার।'

ভেড়ার বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করতে বসল কাজল। প্রথমে ওটার পা ডলে ডলে গরম করল সে। তারপর সারা গা ম্যাসাজ করে দিতে থাকল। কিশোর আর নেহাল মিয়া দু'জনকেই অবাক করে উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটা। ব্যাঁ-ব্যাঁ করে চেঁচাতে শুরু করল।

'মনে অয় বাইচ্চা গেলগা,' নেহাল মিয়া বলল।

'আমারও তাই মনে হয়,' কাজল বলল। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। 'মাসখানেক পশু চিকিৎসার ট্রেনিং নিয়েছিলাম। কাজে লেগে যাচ্ছে।'

খামারের বাইরে তখন কর্মব্যস্ততা। ট্রাক, ঠেলাগাড়ি এ সবের শব্দ। কি চলছে ওখানে ভালমত দেখার জন্যে বাইরে বেরোল কিশোর। পেছন পেছন এল কাজল।

হঠাৎ গোলাঘরের একপাশ থেকে ছুটে বেরোল একটা গাড়ি। তীব্র গতিতে ছুটে এল দু'জনের দিকে। ওদের দেখেও সরার চেষ্টা করল না ড্রাইভার, কিংবা ইচ্ছে করেই সরাল না। বরং যেন চাপা দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

লাফ দিয়ে সরে গেল আতঙ্কিত কিশোর আর কাজল। গোলাঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। আর সরার জায়গা নেই।

তিন

স্যাৎ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল মস্ত গাড়িটা। অল্পের জন্যে লাগল না কিশোর বা কাজলের গায়ে। গাড়ির প্যাসেঞ্জার সীটে দাঁড়ানো একটা ছোট কুকুর। পাশ দিয়ে যাবার সময় গলা বাড়িয়ে খেঁক-খেঁক করে চিৎকার শুরু করল ওদের উদ্দেশে।

ধমক দিয়ে কুকুরটাকে থামানোর চেষ্টা করল ড্রাইভার। থামল না কুকুরটা।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল লোকটা। দরজা খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। খাটো, গাট্টাগোট্টা শরীর। ভারী পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল ছেলেদের কাছে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন ওদেরই দোষ। কটমট করে তাকাল কাজলের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা কোথায়?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে অভিযোগের সুরে কাজল বলল, 'আরেকটু হলেই তো দিয়েছিলেন মেরে! ঘটনাটা কি?'

তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল লোকটা। তর্ক বা ঝগড়ার মধ্যে আর না গিয়ে কিশোরের পরিচয় করিয়ে দিল কাজল, 'হারুণ আঙ্কেল, ও কিশোর পাশা। আমার

বন্ধু। আমেরিকায় থাকে। কিশোর, উনি আমাদের প্রতিবেশী।'

পরিচয়টাকে স্বাগত জানাল না হারুণ। কুতকুতে চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড কিশোরের দিকে। তারপর আচমকা খেঁকিয়ে উঠল, 'তোমার নাম যেন কোথাও শুনেছি? খবরের কাগজেই পড়েছি মনে হয়। কি ব্যাপার, খবরের কাগজের খবর হলে কেন? চুরিদারি করে জেলে গিয়েছিলে নাকি? না মস্তানি-চাঁদাবাজি করতে?'

লোকটার অভদ্রতায় অবাক হয়ে গেল কিশোর। রাগ লাগল। জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার হাত ধরে চাপ দিয়ে কথা না বলতে ইঙ্গিত করল কাজল। লোকটার দিকে তাকাল, 'হারুণ আঙ্কেল, বাবা বোধহয় ফ্যাক্টরিতে। সকালে উঠে ওখানেই আগে যায়।'

আর কিছু না বলে গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল লোকটা। গটমট করে হেঁটে গিয়ে তার গাড়িতে উঠল। দড়াম করে দরজা লাগাল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে, গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। একনাগাড়ে চিৎকার করতেই থাকল তার কুকুরটা।

কিশোরকে বলল কাজল, 'লোকটা যেন কেমন, তাই না? কিন্তু তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেই হয় আমাদের। বাধ্য হয়ে। কারণ বাবার সবচেয়ে বড় ক্রেতাদের একজন ও। যাকগে। ফ্যাক্টরি দেখতে যাবে? পার্চমেন্ট কিভাবে বানায় দেখবে না?'

'হ্যাঁ, চলো।'

একসারি একতলা বিল্ডিঙের দিকে এগোনোর সময় কাজল বলল, 'সাংঘাতিক গন্ধ কিন্তু। সহ্য করতে পারবে তো?'

হাসল কিশোর। 'তোমরা পারলে আমি পারব না কেন?'

'আমাদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'যত খারাপ গন্ধই হোক, দেখব। পার্চমেন্ট কিভাবে বানায় দেখার এ সুযোগ ছাড়তে আমি রাজি না।'

সারির প্রথম ঘরটাতে ঢুকল দু'জনে। এখানে ভেড়ার গা থেকে লোম কাটা হয়। বৈদ্যুতিক ছুরির সাহায্যে। খুব দ্রুত কাটে। একটা ভেড়ার লোম কাটা হচ্ছে। মাঝে মাঝেই আর্তচিৎকার করে উঠছে ভেড়াটা। ব্যথা পাচ্ছে। অসাবধানে চামড়ায় বসে যাচ্ছে ছুরির ফলা।

লোম কাটা শেষ হতে ছেড়ে দেয়া হলো ভেড়াটাকে। তারের বেড়া দেয়া একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হলো ওটাকে। আরেকটাকে ধরা হলো লোম কাটার জন্যে।

ওখান থেকে বেরিয়ে কিশোরকে কসাইখানায় নিয়ে এল কাজল।

'হ্যাঁ, সত্যিই দুর্গন্ধ!' নাক কুঁচকে বলল কিশোর।

'এখানে শুধু ভেড়া না, গরুও জবাই করা হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাংস টিনজাত করে বাজারে পাঠানো হয়। কাজল জানাল, বাংলাদেশে এ ধরনের আরও কারখানা গড়ে ওঠা উচিত। মাংস কেটে খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে যে ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তারচেয়ে এটা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। তা ছাড়া ক্রেতা-বিক্রেতা দু'জনেরই সুবিধে এতে অনেক বেশি। রক্ত, রস, গন্ধ ছড়ানোর ভয় নেই, মাংস রাখার জন্যে কসাইখানাও লাগবে না। যে কোন মুদি দোকানেও অন্যান্য টিনজাত জিনিসের মত সাজিয়ে রেখে বিক্রি করা যাবে।

এ তথ্য নতুন নয় কিশোরের কাছে। ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে মাংস টিনজাত করার প্রচুর কোম্পানি আছে।

গন্ধ থেকে বাঁচার জন্যে নাকে হাতচাপা দিয়ে রাখল কিশোর। 'চলো, পার্চমেন্ট কিভাবে বানানো হয় সেটা দেখি।'

কিশোরকে নিয়ে আরেকটা বিল্ডিঙে ঢুকল কাজল। ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ভেড়ার কাঁচা চামড়া থেকে লোম পরিষ্কার করছে শ্রমিকেরা।

'লোম পুরোপুরি তুলে ফেলার পর চুন ছড়িয়ে রাখা হয় চামড়ার ওপর,' কাজল জানাল। 'চামড়ায় লেগে থাকা চর্বি কেটে যায় তাতে। তারপর চৌবাচ্চায় ফেলে ভালমত ধোয়ার পর টানটান করে ফ্রেমে আটকে ঝুলিয়ে দেয় শুকানোর জন্যে। ওই দেখো, কিভাবে ঝোলানো হয়েছে। এ ভাবে শুকালে খুব মসৃণ থাকে চামড়ার ভেতরের দিকটা।'

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'কাজটা খুব সহজ না। শুকানোর পর কি করে?'

'চামড়া থেকে আরেক পরত পর্দা তোলা হয়,' কাজল জানাল। 'তারপর সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে। ঘষতে ঘষতে পাতলা করে ফেলে।'

'অদ্ভুত কাণ্ড!' কিশোর বলল। 'এটাই পার্চমেন্ট? স্টেশনারি দোকানে গিয়ে কিনতে চাইলে যে জিনিস হাতে ধরিয়ে দেয় দোকানী সেগুলো এ ধরনের ভেড়ার চামড়ার টুকরো?'

'হ্যাঁ,' হেসে বলল কাজল। 'কাঠ থেকে মেশিনে যে কাগজ তৈরি করা হয়, তা থেকে এ জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা। দামও অনেক বেশি। কেবল অতি সৌখিন লোকেরাই চিঠি লিখতে এ জিনিস ব্যবহার করে। আমাদের দেশে এ জিনিসের প্রচলন কম। নেই বললেই চলে। কাগজের সঙ্গে এর তফাৎ হলো, এটা অনেক বেশি টেকসই।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'তারপরেও আমি কখনও চিঠি লিখতে কোন প্রাণীর চামড়াকে ব্যবহার করতে যাব না। টেকসই বলেই নিশ্চয় আর্টিস্টরাও পার্চমেন্টের ওপর ছবি আঁকে। ওহ্‌হো, কারখানা দেখতে দেখতে আসল কথাটাই ভুলে গেছি। পার্চমেন্টে আঁকা ছবি রহস্যের সমাধান করতে হবে না?'

'আমি ভুলিনি। সেটা পরেও করা যাবে। চলো, আগে এক বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এখানকার কর্মচারী শ্রমিকই, তবে কারখানার নয়, ভেড়ার রাখাল। আবদুল ওহাব। সবাই ডাকে ভেড়া ওহাব। তাতে অবশ্য সে মাইন্ড করে না।' হাত তুলে দূরে দেখাল কাজল, 'ওই যে ওদিকে বনের মধ্যে তার ঝুপড়ি।'

'অনেক দূর,' কিশোর বলল।

'হাঁটতে না চাইলে মোটর সাইকেল নিতে পারি। নেব?'

'না না, লাগবে না। হেঁটেই যেতে পারব। বনের মধ্যে হাঁটতে ভাল লাগবে। যা দারুণ সুন্দর জায়গা।'

একটা ছাউনির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিকলে বাঁধা একটা কুকুর দেখা গেল। কাজলকে দেখে চেঁচাতে শুরু করল কুকুরটা।

হেসে এগিয়ে গেল কাজল। কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কি রে, চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'ছেড়ে দিতে বলছে আরকি,' কিশোর বলল। 'কি নাম ওর?'

'ডিংগো। অস্ট্রেলিয়ান বুনো কুকুরের নামে নাম।'

'বুঝলাম। কিন্তু দেশি কুকুরের অস্ট্রেলিয়ান নাম কেন?'

'রাখলাম। ডিংগো কুকুরগুলোকে আমার ভাল লাগে। পেলে এনে পুষতাম।' কুকুরটার শিকল খুলে দিল কাজল। 'ডিংগো। ও কিশোর পাশা। আমাদের বন্ধু। হাত মেলা।'

পেছনের দুই পা মুড়ে বসে সামনের একটা থাবা তুলে দিল ডিংগো। সেটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল কিশোর, 'বাহ, তুইও তো দেখি আমাদের রাফির মত। ভাল বন্ধুত্ব হবে তোদের।'

মুখ উঁচু করে ঝাঁকি দিয়ে ডিংগো বলল, 'খুফ! খুফ!' যেন বোঝাতে চাইল, আগে আসুক তো।

হাসতে লাগল কিশোর, 'মহাপণ্ডিত।' ডিংগোর কানের গোড়া চুলকে আদর করে দিল। তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল কুকুরটার। 'তা কি করিসরে তুই? ভেড়া পাহারা দিস নাকি?'

ভেড়ার কথাতে কান খাড়া করে ফেলল কুকুরটা। সোজা রওনা হলো বনের দিকে, কিশোররা যেদিকে যাচ্ছিল। পিছে পিছে যেতে যেতে কিশোরকে জানাল কাজল, 'ভেড়া খুব ভালবাসে ডিংগো। আবদুল ওহাবকেও। ছাড়া পেয়েই কেমন ছুটেছে ওদিকে দেখো না।'

খামারের প্রান্তে বড় বড় গজারি গাছগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লেগে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন গাছের বেড়া। সেগুলোর নিচ দিয়ে বনে ঢুকল ওরা। এখানে একেবারে ভিন্ন পরিবেশ, খামারের চেয়ে আলাদা। গাছের মাথায় ডালপালার ফাঁক

দিয়ে রোদের বর্শা এসে বিচিত্র আলোর নকশা সৃষ্টি করেছে মাটিতে। বাতাসে গজারি বনের মিষ্টি সুবাস। কিঁচিক করে ডাক ছেড়ে দুটো শালিক উড়ে গেল। একটা দোয়েল এসে বসল মাথার ওপরের ডালে। মিষ্টি শিস দিয়ে তার সঙ্গিনীকে ডাকতে শুরু করল। রূপকথার রাজ্য মনে হতে লাগল কিশোরের। দু'চোখ মেলে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছে সে, বেরসিকের মত কানে বেজে উঠল কাজলের কণ্ঠ, 'ওই যে, আবদুল ওহাবের ঝুপড়ি।'

গাছের ফাঁক দিয়ে একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল কিশোরের।

'কিন্তু গেল কোথায় ওহাব?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কাজল। 'ঘরের বাইরে থাকলে সারাক্ষণ ওই বড় গাছটার শিকড়ে বসে থাকে। আপনমনে বিড়ি ফোঁকে আর আধ্যাত্মিক গান গায়।'

'ভেড়ার পাল কই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে, ওই ওদিকটায়,' হাত তুলে দেখাল কাজল। 'ওই ঝোপগুলো পেরোলেই দেখতে পাবে। বড় বড় ঘাস আছে। পাশে ডোবা আছে। শত্রুও আছে।'

'চোর?'

মাথা ঝাঁকাল কাজল, 'হ্যাঁ।'

'মানুষ।'

হাসল কাজল। 'মানুষও আছে, জন্তুও আছে।'

'ভেড়ার এক নম্বর শত্রু তো জানি নেকড়ে আর কায়োট। কিন্তু বাংলাদেশে তো ওই দুটো জানোয়ারের একটাও নেই।'

'তা নেই। তবে ওদের জাতভাই শেয়াল তো আছে। শেয়ালের অভাব নেই গজারিবনে। বাঘা বাঘা সাইজের একেকটা। সুযোগ পেলে কবর থেকে মানুষের লাশ তুলে খেয়ে ফেলে, আর ছাগল-ভেড়া তো ওদের কাছে রসগোল্লা। ভেড়া আর ছাগলের বাচ্চার জাতদুশমন ওই শেয়াল।'

ওহাবের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল কাজল।

সাড়া পেল না।

অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে আনমনে বিড়বিড় করল, 'আশ্চর্য! গেল কোথায় লোকটা?'

ওর পায়ের কাছেই দাঁড়ানো ছিল ডিংগো। আচমকা এক হাঁক ছেড়ে দৌড় দিল ঝোপগুলোর দিকে।

কিশোরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কাজল। 'চলো তো দেখি! নিশ্চয় কোন অঘটন!'

চার

কাজলের পেছন পেছন দৌড় দিল কিশোর। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভেড়ার পাল। কোনটা দাঁড়ানো, কোনটা ঘাস খাচ্ছে, কোনটা শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঝখান দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে পায়ে বেধে যায়। শুয়ে থাকা একটা ভেড়াকে ডিঙাতে গিয়ে একটা ভেড়ার বাচ্চার লেজ মাড়িয়ে দিল কিশোর। ব্যাঁ করে চিৎকার দিয়ে উঠল বাচ্চাটা।

'ইস্ রে!' বলে তাড়াহুড়ার মধ্যেও বসে পড়ে বাচ্চাটার লেজটা ডলে দিল কিশোর। তারপর আবার উঠে দৌড় দিল কাজলের পেছনে।

দৌড়াতে দৌড়াতে একটা ঝোপের অন্যপাশ ঘুরে এসে দেখা গেল সামনে বেশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে জায়গাটা। ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে দেখা গেল দু'জন লোককে।

'ওরাই বোধহয় এই গোলমালের কারণ,' কাজলকে বলল কিশোর। 'চেনো নাকি ওদের?'

'না। বোধহয় ভেড়া চুরি করতে এসেছিল।'

বেশ অনেকটা দূরে রয়েছে লোকগুলো। এত দূর থেকে চেহারা চেনা যাচ্ছে না। দৌড়াতে দৌড়াতে গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। পিছু নিয়ে ধরা যাবে না বুঝে থেমে গেল কাজল। তার ঘাড়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল কিশোর।

আগে আগে ছুটছিল ডিংগো। কিশোররা দাঁড়িয়ে যেতেই সে-ও দাঁড়িয়ে গেল। অনেকটা এগিয়ে ছিল, ফিরে এল লেজ নাড়তে নাড়তে।

মাথা চাপড়ে ওকে আদর করে দিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল কাজল। 'কিন্তু ওহাব গেল কই?'

কিশোরও চারপাশে তাকিয়ে ভেড়ার রাখালকে খুঁজতে লাগল।

কাজল বলল, 'ভেড়া ফেলে তো কোথাও যায় না সে। আশ্চর্য! চলো তো ওর ঘরে গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। কুম্ভকর্ণের ঘুম নাকিরে বাবা। এত হাঁকডাকেও ভাঙে না!'

ওহাবের ঝুপড়ির কাছে ফিরে এল দু'জনে। নাম ধরে ডাকতে লাগল কাজল। জবাব নেই। ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল। নেই ওহাব।

'সত্যিই অবাক লাগছে! দুশ্চিন্তাও হচ্ছে!' ডিংগোকে নির্দেশ দিল কাজল, 'ডিংগো, দেখ্ তো ওহাব কোথায়। খুঁজে বের কর।'

মাথা কাত করে কাজলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ডিংগো। নাক নিচু করে মাটি শুঁকতে শুরু করল। তারপর এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে। চলে গেল ঝোপঝাড়ের দিকে।

ঝুপড়িটার আশেপাশে খুঁজে দেখল কাজল আর কিশোর। ওহাব কোথায় গেল কিছুই বুঝতে পারল না।

'অবাক কাণ্ড!' কাজল বলল। 'ভেড়া ফেলে চলে গেছে ওহাব, বিশ্বাসই করতে পারছি না। কখনোই ভেড়ার পালকে ছেড়ে রেখে এ ভাবে সরে না সে।'

ঠিক এই সময় ডিংগোর ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। দৌড় দিল সেদিকে দু'জনে। ঝোপ পেরিয়ে এসে কতগুলো চারাগাছের জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ডিংগোকে। ওহাবের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে সে। মাটিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে বুড়ো ওহাব।

তার দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কিশোর আর কাজল। ঠোঁট নড়ে উঠল ওহাবের। জ্ঞান ফিরতে শুরু করেছে। বিড়বিড় করে কি যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকাল কিশোর। নীরবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল কাজল, সে-ও কিছু বুঝতে পারছে না।

আবার বিড়বিড় করল ওহাব।

কিশোরের দিকে তাকাল কাজল। 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি?'

'ঘুমায়নি তো। বেহুঁশ হয়ে গেছে।'

'খুব সময়মত চলে এসেছিলাম। নইলে আজকে ক'টা ভেড়া যে গাপ করে দিত আল্লাহই জানে।'

'কিন্তু ভেড়া চুরি করতে এসেছিল, না অন্য কিছু করতে এসেছিল, জানছ কি করে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা-ও তো কথা,' মাথা নেড়ে সায় জানাল কাজল। 'দেখি, ওহাবের হুঁশ ফিরলে হয়তো কিছু বলতে পারবে। ওর হুঁশ ফেরানো দরকার।'

ডোবা থেকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে এসে ওহাবের চোখেমুখে ছিটাতে শুরু করল দু'জনে। খানিক পরেই চোখ মেলল ওহাব। কাজলকে তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে মলিন হাসি হাসল। কাজল আর কিশোরের সহযোগিতায় দুর্বল-ভঙ্গিতে উঠে বসল।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করল ওহাব। কিশোরকে দেখিয়ে কাজলকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কে?'

'আমার বন্ধু। আমেরিকায় থাকে,' কাজল বলল।

লজ্জিত ভঙ্গিতে ওহাব বলল, 'ঘুমাইয়া গেছিলাম। ক্যান যে এইভাবে ঘুমাইয়া পড়লাম কে জানে!'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল কাজল আর কিশোর। ওহাব মিথ্যে বলছে বুঝে গেল। কাজল বলল, 'ওহাবভাই, তুমি ঘুমাওনি। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে। কি হয়েছিল?'

মাথা নিচু করল ওহাব। ভাবল কিছু। মুখ তুলল আবার। 'কাজলভাই, আমি আপনের কাছে কিছু লুকামু না। দুইডা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আইছিল। আমারে একটা কাম কইরা দেয়নের লাইগা চাপাচাপি করতে লাগল। কোনমতেই যখন রাজি অইলাম না, খেইপ্পা গিয়া মাথায় মারল বাড়ি। আমারে কিচ্ছু করনের সুযোগ দিল না। তারপর আন্ধার দুনিয়া।'

লোকগুলোকে দৌড়ে যেতে দেখেছে, জানাল কাজল।

'ওরা খারাপ লোক, কাজলভাই,' ওহাব বলল। 'খুব খারাপ। ওদের ধরার লাইগা পিছে পিছে যে যান নাই, খুব ভালা করছেন।'

লোকগুলো কেন দেখা করতে এসেছিল, কি কাজ করে দিতে বলেছে, বার বার জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পেল না কাজল। মাথা নেড়ে ওহাব বলল, 'আমারে আর জিগাইয়েন না, কাজলভাই। আমি কইবার পারুম না। খালি এইটুক শোনেন, আমারে ইমুন একটা কাম করবার কইছিল, যেইডা আমি কোনমতেই করতে রাজি অই নাই। কাজলভাই, যা অইছে অইছে, ভুইলা যান। ওদের পিছে লাগনের কাম নাই। বড় রকমের ক্ষতি কইরা ফালাইব।'

শক্তি অনেকটা ফিরে পেয়েছে ওহাব। উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে লাগল তার ঝুপড়ির দিকে। সঙ্গে এগোল কাজল আর কিশোর। পুরোটা সময় চুপচাপ ওদের কাছে বসে ছিল ডিংগো। সে-ও চলল ওদের সঙ্গে।

ঝুপড়িটার কাছে এসে ফিরে তাকাল ওহাব। কিশোরকে দেখিয়ে কাজলকে বলল, 'মেমান লইয়া আইছেন। একটু বসেন। ডাব পাইরা রাখছি। দুইডা ডাব কাইট্টা লইয়া আসি।'

দৌড়াতে দৌড়াতে গলা শুকিয়ে গেছে দু'জনেরই। ডাবের কথা শুনে খুশিই হলো কাজল। বলল, 'ঠিক আছে নিয়ে এসো। আমরা ওই গাছের শিকড়টায় বসছি।'

দুই হাতে দুটো কাটা ডাব নিয়ে ফিরে এল ওহাব। পানি খেয়ে খালি খোসাটা ফেলে দিয়ে পকেট থেকে একটা মোবাইল টেলিফোন বের করল কাজল। ওহাবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এটা রেখে দাও। আবার যদি এ ধরনের কোন অঘটন ঘটে, কিংবা কেউ তোমাকে হুমকি দিতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানাবে।'

হাতে নিয়ে সেটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে লাজুক হাসি হেসে ওহাব বলল, 'কিন্তু আমি যে এইডা ব্যবহার করতে জানি না, কাজলভাই।'

'দাও, শিখিয়ে দিচ্ছি।'

ওহাবের বুদ্ধিশুদ্ধি ভালই। শিখতে সময় লাগল না। কোন্ নম্বরে ফোন করলে কন্ট্রোলরুমের সঙ্গে কথা বলতে পারবে সেটাও মুখস্থ করে নিল। কথাও বলল একবার। দু'গালে ছড়িয়ে গেল হাসি। মাথা দুলিয়ে বলল, 'খুব ভালা জিনিস।'

ওহাবকে সাবধান থাকতে বলল কাজল। কিশোরকে নিয়ে খামারে ফিরে চলল।

কিশোর বলল, 'মোবাইল ব্যবহারের সময় দেবে কিনা সন্দেহ। ওকে যে পিটিয়ে বেহুঁশ করে ফেলবে, ও তো বুঝতেই পারেনি।'

মাথা ঝাঁকাল কাজল। 'তা ঠিক। তবে ওদের আসতে দেখে যদি সতর্ক হয়ে গিয়ে ফোনটা করে ফেলতে পারে, তাহলে ধরার ব্যবস্থা করা যায়।'

'ওকে কি কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল লোকগুলো, কিছু অনুমান করতে পারো?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কাজল। 'হয়তো ভেড়া চুরি করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ও যাতে চেঁচামেচি না করে সেজন্যে টাকা দিতে চেয়েছিল।'

'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। চুরিদারির মত সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। তাহলে আমাদের বলে দিত। ওর নিজস্ব কোন ব্যাপার হতে পারে, যেটাতে সে জড়িত। এর সঙ্গে খামারের সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে।'

'সেটা কি?'

'জানতে পারলে ভাল হত,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে দু'তিনবার চিমটি কাটল কিশোর।

'চলো, বাবাকে গিয়ে বসি। বাবা হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পারবে।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবে হাঁটার পর কাজল বলল, 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। ভেড়া চুরি যাওয়া, কিংবা শেয়ালে নেয়া নতুন কিছু না। কিন্তু খামারের সীমানায় ঢুকে রাখালকে পিটিয়ে বেহুঁশ করার ঘটনা এই প্রথম। ভাল লাগছে না আমার। কোথায় যেন কি একটা খটকা রয়ে গেছে। লোকগুলোর চেহারা দেখতে পারতাম যদি, চিনতে পারতাম, ভাল হত!'

বাড়ি ফিরে বাবাকে সব কথা জানাল কাজল।

শুনে গম্ভীর হলেন খান সাহেব। 'পুলিশকে জানানো দরকার।' টেলিফোন করতে চলে গেলেন তিনি।

দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিংটার দিকে তাকাল কিশোর। যেটার রহস্য সমাধান করতে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। পার্চমেন্টে আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল।

টেলিফোন সেরে ফিরে এলেন খান সাহেব। কিশোরের পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বুঝতে পারলে নাকি?'

'আর্টিস্টের নামটাম তো দেখতে পাচ্ছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'সাধারণত

কোণের দিকে নাম সই করে রাখে শিল্পীরা। এটাতে দেখছি না।'

'নেইই যখন, দেখবে আর কোত্থেকে,' খান সাহেব বললেন।

'প্রথম ছবিটা একজন সুন্দরী মহিলার,' আপনমনেই বলল কিশোর। 'কিন্তু ছবিতে কিছু করতে দেখা যাচ্ছে না তাকে। কোন মেসেজ দিচ্ছে না এ ছবি। কিংবা দিলেও সেটা বোঝা যাচ্ছে না।'

'তা ঠিক। দ্বিতীয় ছবিটা কি বলে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল কিশোর, 'একজন পুরুষ মানুষের দেহের ওপরের অংশ...পেছন করা...দৈহিক গঠন কেমন, চুলের রঙ কি, বোঝা যায় এ থেকে। কিন্তু কি বোঝাতে চেয়েছে এখনও মাথায় ঢুকছে না আমার।'

'হুঁ,' খান সাহেব শুধু বললেন।

'চারটে ছবির মধ্যে তিন নম্বর ছবিটা চোখে পড়ে বেশি,' নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর। 'বাতাসে উড়ন্ত আলখেল্লা পরা দেবদূতের দল। মাঝখানের দেবদূত একজন শিশুকে তুলে ধরে রেখেছে। বাকি সবাই ভক্তি সহকারে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। সুন্দর ছবি। খুব দক্ষ শিল্পীর পক্ষেই কেবল এত সুন্দর করে আঁকা সম্ভব। এখানেও কোন মেসেজ নিশ্চয় আছে।'

'তবে চার নম্বর ছবিটা বোঝা যায়,' কাজল বলল। 'একটা নৌকাকে গুঁতো মারছে একটা জাহাজ–দুর্ঘটনা বোঝাতে চেয়েছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দুর্ঘটনাটা কোন্ ধরনের? স্বাভাবিক, না ইচ্ছাকৃত? জেনেশুনে ইচ্ছে করেই নৌকাটাকে গুঁতো মেরেছে হয়তো জাহাজটা, আরোহীদের খুন করার জন্যে,' কিশোর বলল।

আচমকা কি মনে হতে ঝটকা দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। খান সাহেবের দিকে তাকিয়ে যেন ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা, 'আঙ্কেল, ছবিটা কার কাছ থেকে কিনেছেন?'

'আমার প্রতিবেশী, হারুণ চৌহানের কাছ থেকে,' জবাব দিলেন খান সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিতে ভরা সেই লোকটার চেহারা মনের পর্দায় ভেসে উঠল কিশোরের, যে আরেকটু হলেই গাড়ি দিয়ে গুঁতো মেরে দিচ্ছিল ওদের। 'তিনি কোথায় পেয়েছেন, বলেছেন আপনাকে?'

'নিলামে কিনেছিল কোনখান থেকে। কিছুদিন রেখে ভাল না লাগায় বিক্রি করে দিয়েছে। আমি পার্চমেন্টে আগ্রহী জেনে আমাকেই বলেছে প্রথমে।'

'মিস্টার চৌহান ছবিগুলোর রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন?'

'না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, এর মধ্যে যে কোন রহস্য আছে, এ কথাটাই তার মাথায় আসেনি। কোনও কৌতূহল দেখায়নি।'

'ফ্রেম থেকে ছবিটা কখনও খুলেছিলেন?'

'না,' জবাব দিলেন খান সাহেব। 'কেন?'

'পেছনেও যে মেসেজ থাকতে পারে, জরুরী কোন সূত্র, সেকথা ভেবেছেন?'

'না তো!' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন খান সাহেব। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক্ষুণি খুলছি।'

পাঁচ

খুব যত্ন করে ফ্রেম লাগানো হয়েছে ছবিটার। দেখে মনে হয় না লাগানোর পর কখনও খোলা হয়েছে। সাবধানে পেছনের কাগজ আর মলাট খুলে নিলেন তিনি। বের করে আনলেন ছবিটা। সবার দেখার জন্যে তুলে ধরলেন।

'বাহ্, খোলা অবস্থায় তো আরও বেশি সুন্দর!' কাজল বলল।

কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন খান সাহেব। হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল কিশোর।

'এই যে, পেছনে "এ" লেখা।' ছবিটা ওল্টাল সে। 'দেখুন, অক্ষরটা বাচ্চার ছবিটার ঠিক পেছনে রয়েছে।'

'মানে কি এর?'

'নামের আদ্যক্ষর হতে পারে।'

'আর কিছু লেখা আছে নাকি দেখো তো,' ছবিটার দিকে ঝুঁকে এল কাজল।

'আছে, এই যে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ডান দিকের নিচের কোনায় লেখা রয়েছে ইংরেজি "এস" ও "সি" দুটো অক্ষর। এস সি, এ দুটোও কারও নামের আদ্যক্ষর হতে পারে। তার নিচে লেখা "ইয়াঙ্গুন"।'

'ইয়াঙ্গুন!' ভুরু কুঁচকালেন খান সাহেব। 'আগের রেঙ্গুন শহরের কথা বলেনি তো?'

'হতে পারে,' মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'আঙ্কেল, হারুণ চৌহান কোথাকার লোক কখনও জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'না তো।'

'আমার মনে হয় হারুণ চৌহান মিয়ানমারের লোক। ইয়াঙ্গুনে বাড়ি : কিংবা ওখানে থেকেছেন।'

'এবং ওখানেই কিনেছিল ছবিটা,' কিশোরের কথাটা যেন লুফে নিলেন খান সাহেব। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'গোয়েন্দা হিসেবে কেন তোমার এত নাম, এখন বুঝতে পারছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কত সূত্র বের করে ফেললে। ফ্রেম খুলে সূত্র খোঁজার কথা মাথায়ই আসেনি আমার।'

'এখনই প্রশংসা শুরু করে দেবেন না,' হেসে বলল কিশোর। 'আগে পুরো রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করি।'

চোখ সরু করে কিশোরের দিকে তাকাল কাজল। 'তদন্ত করতে মিয়ানমারে যাবে নাকি?'

'তার আগে মিস্টার চৌহানের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তিনি হয়তো মূল্যবান আরও অনেক তথ্য জানাতে পারবেন।'

একমত হলেন কাজলের বাবা। 'আজ রাতেই আবার চলে যেয়ো না। সকালটা হোক। তারপর।'

হারুণের ফার্মের কথা কাজলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। কাজল বলল, 'ফার্মটা তো জানিই কোনখানে। তবে ভেতরে যাইনি কখনও। ভেতরটা কেমন জানি না। বাবা, তুমি জানো কিছু?

'জানি,' খান সাহেব বললেন। 'যাওয়ার আগে অবশ্যই হারুণ সাহেবের অনুমতি নিয়ে নেবে। কোনমতেই যেন ভেবে না বসে আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরকে। ছবি রহস্যের সমাধান হোক বা না হোক, কেউ আমাকে বিনা কারণে সন্দেহ করলে ভাল লাগবে না আমার। হারুণ চৌহান আমার একজন বড় কাস্টোমার। তাকে খোয়াতে চাই না।'

অনুমতি নিয়েই যাবে, কথা দিল কিশোর। আর এমন কিছু করবে না যাতে খান সাহেবের মানহানি হয়।

আপাতত আর কোন কাজ নেই। ঘুমাতে গেল দুই গোয়েন্দা।

পরদিন সকালে নাস্তার পর মোটর সাইকেল নিয়ে বেরোল দু'জনে। চৌহান ফার্মের সামনে এসে থামল। কিশোর লক্ষ করল মূল বাড়িসহ ফার্মের সমস্ত বাড়িগুলোকে ঘিরে উঁচু দেয়াল। মেইন গেটে লোহার দরজা। অতিরিক্ত সুরক্ষিত। কি প্রয়োজন এর বুঝতে পারল না কিশোর। অবাক হয়ে তাকাল কাজলের দিকে। কাজলও অবাক।

'কেন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন আঙ্কেল, এখন বুঝলাম,' কিশোর বলল। 'লোকটা অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। বিদেশী যে আমি এখন শিওর। কাউকে বিশ্বাস করে না মনে হয়। নইলে নিজের বাড়িঘরকে এ ভাবে জেলখানা বানিয়ে রাখার মানে কি? এ রকম বন্দি হয়ে কি বাঁচা যায়!'

গেটের পাল্লায় ঠেলা দিল কাজল। ভেতর থেকে বন্ধ। 'ডাকার উপায় কি?'

'এই যে, ঘণ্টার বোতাম,' টিপে দিল কিশোর।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। সাড়া পেল না। আবার বোতাম টিপল কিশোর। টিপে ধরে রাখল কয়েক সেকেন্ড। তারপরেও জবাব এল না।

'ঘণ্টা শুনছে না কেউ এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' কাজল বলল। 'দূরে তো। আসতে দেরি হচ্ছে। নিশ্চয় এসে খুলে দেবে।'

[illegible] দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'চেষ্টা করলে ডিঙানো যায়। করব নাকি?'

'কেউ খুলে না দিলে আর কি করব? দেয়াল ডিঙিয়েই ঢুকতে হবে,' কাজল বলল।

হাত উঁচু করে লাফ দিয়ে দেয়ালের কিনার ধরে ঝুলে পড়ল দু'জনে। তারপর বেয়ে উঠে গেল ওপরে। লাফিয়ে নামল ওপাশে। সামনে একটা লম্বা গলি। দু'পাশে দেয়াল।

'একেবারেই তো জেলখানা,' গলা লম্বা করে দিয়ে গলির ওপাশে কি আছে দেখার চেষ্টা করল কাজল। 'আল্লাহই জানে, সামনে কি দেখব! হয়তো দেখা যাবে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: এখানকার মানুষ হইতে সাবধান, কামড়ে দিতে পারে!'

'ভাল বলেছ তো!' হেসে ফেলল কিশোর। 'তবে সাবধান। চোখকান খোলা রাখো। কোন কিছু মিস করতে চাই না। ওই দেখো, বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো। তারমানে বাড়িতে লোক আছে। জরুরী মীটিঙে বসেছেন হয়তো মিস্টার চৌহান। এ সময় আমাদের মত উটকো ঝামেলা সহ্য না-ও করতে পারেন। এ জন্যেই ঘণ্টার শব্দে কান দেয়নি কেউ।'

এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। পাকা বড় বাড়িটার সামনে প্রায় পৌঁছে গেছে, হঠাৎ কানে এল মাথার ওপরে ডানা ঝাপটানোর শব্দ। চমকে মুখ তুলে তাকাল ওরা। মুহূর্তে বড় বড় এক ঝাঁক কালো রঙের পাখি হামলা চালাল ওদের ওপর।

'উফ্!' চিৎকার করে উঠল কাজল। 'ব্যথা লাগছে! আরে, সর্, সর্ না আমার ওপর থেকে!'

গায়ের ওপর থেকে পাখিগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল দু'জনে। কিন্তু ধারাল নখ আর ঠোঁট দিয়ে ওদেরকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল পাখিগুলো। চোখ বাঁচানোর জন্যে একহাতে চোখ ঢেকে রাখল ওরা, অন্য হাতে থাবা মেরে সরানোর চেষ্টা করল। লাভ হলো না। সরাতে পারল না পাখিগুলোকে। ঠুকরে, আঁচড়ে রক্তাক্ত করতে লাগল ওদের।

আর কোন উপায় না দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচানো শুরু করল দু'জনে, 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছো, ভাই!'

কিন্তু পাখির কর্কশ কলরব ঢেকে দিল ওদের চিৎকার। ওদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল না কেউ। শেষে মাটিতে গোল হয়ে বসে, বুকের ওপর মুখ গুঁজে দিয়ে দুই হাতে মাথা ঢাকল। তাতে যেন আরও খেপে গেল পাখিগুলো। বিকট চিৎকারে কান ঝালাপালা করে দিয়ে অসহায় অনুপ্রবেশকারীদের ঠুকরে চলল সমানে।

এর মধ্যেই আরেকবার কোনমতে মাথা উঁচু করে, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করে উঠল কাজল।

'ওর এই শেষ চিৎকার, নাকি বাড়ির দিক থেকে আসা লোকজনের চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে অবশেষে ঠোকরানো বন্ধ করল পাখিগুলো, বুঝতে পারল না গোয়েন্দারা। কয়েকজন লোক চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল। উড়ে গেল পাখিগুলো।

গোমড়ামুখো একজন লোক এসে দাঁড়াল গোয়েন্দাদের সামনে। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'এখানে ঢুকেছ কেন?'

কাজল ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ওরা মিস্টার চৌহানের প্রতিবেশী। ভেড়ার ফার্মটা ওদের। একটা জরুরী কাজে দেখা করতে এসেছে। 'প্লীজ, আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন!'

'উঁহু, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না,' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল লোকটা। 'তিনি এখন জরুরী মীটিঙে আছেন। ঢুকলে কি করে তোমরা?'

জবাব দিল না দুই গোয়েন্দা। বাকি লোকগুলোকেও এসে দাঁড়াতে দেখল প্রথম লোকটার পেছনে। লোকগুলোর ভাবভঙ্গি মোটেও সুবিধের না। মিস্টার চৌহানের প্রহরীরা ভাল মানুষ নয় কেউ, ভাবল কিশোর।

'পাখিগুলো কার?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কি পাখি? আলফ্রেড হিচককের বার্ডস ছবিতে ছাড়া এমন মারমুখো হয়ে উঠতে তো দেখিনি কোনও পাখিকে!'

'পাখির মালিক?' খেঁকিয়ে উঠল প্রহরীদের দলনেতা। 'ঢুকেছ বেআইনীভাবে, আবার প্রশ্ন করো। সাহস তো কম না। যাও, বেরোও।'

তাড়াতাড়ি কাজল বলল, 'গেটের তালাটা খুলে দিন, প্লীজ!'

'না, দেব না। ঢুকেছ, এখন বেরোও। কিছু করার চেষ্টা করলে বুঝবে মজা। বেরোও।'

যে পথে এসেছিল সেপথে তাড়াহুড়ো করে ফিরে গেল আবার কাজল আর কিশোর। ওদের পেছন পেছন এল লোকগুলো। গেটের তালা খুলল না কেউ। দেয়াল টপকে ঢুকেছিল, আবার সেভাবেই বেরোতে হলো ওদেরকে।

বাড়ি ফিরে চলল দু'জনে। ছোট একটা বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাজল বলল, 'গলাটা শুকিয়ে গেছে। চলো কোক খাই।'

বাজারের একমাত্র পাকা বড় দোকানটার সামনে মোটর সাইকেল থামাল কাজল। দুটো কোক চাইল। দোকানের মালিক মিরণ পোদ্দার বয়স্ক লোক। সে-ই কোকের বোতলের মুখ খুলে এগিয়ে দিল। কাজলকে চেনে।

'কই গেছিলা?' জিজ্ঞেস করল মিরণ।

'হারুণ চৌহানের বাড়িতে,' কোকের বোতলটা ঠোঁটের কাছে ধরে ঢকঢক করে অর্ধেকটা গিলে ফেলল কাজল। 'চেনেন তো তাকে?'

'চিনমু না ক্যান?' হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল মিরণ। 'তবে মনে অয় মানুষ বেশি বালা না। বাড়িত কতগুলি লোক রাখছে, গুণ্ডাপাণ্ডা। মাঝেসাঝে আসে আমার

দোকানে।' একদিন কয়েকজন আইছিল একটা কথা কইতে। ভাল লাগে নাই আমার। বিদায় কইরা দিছি।'

'ভাল লাগেনি কেন আপনার?'

'দেখো বাবা, কিছু মনে কইরো না। কথাগুলান ব্যবসা নিয়া। এর বেশি কিছু জানতে চাইও না।'

চাপাচাপি করল না কাজল। কোকের দাম মিটিয়ে দিয়ে কিশোরকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

মোটর সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় মিরণের ব্যাপারে কাজলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কাজল বলল, 'এমনিতে লোকটা খারাপ না। কেউ তার ব্যবসার গোপন কথা ফাঁস না করতে চাইতেই পারে। তবে হারুণের লোকগুলোর ওপর কেন সে খাপ্পা, এটা তো বলতে পারত।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'আমার কি মনে হয় জানো? তোমাদের আবদুল ওহাবের কাছে যারা গিয়েছিল, তারাই গেছে মিরণ পোদ্দারের কাছেও। প্রস্তাবটা একই ধরনের হলেও অবাক হব না।'

ছয়

খামারে ফিরল ওরা। হারুণের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যায়, ভাবতে লাগল কিশোর। শেষে ফোন করবে ঠিক করল।

ফোন ধরল অন্য লোক। তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে হারুণের সঙ্গে কথা বলতে চাইল কিশোর। লাইনে থাকতে বলে সেই যে গেল লোকটা, আর আসে না। ধরে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। বেশ কয়েক মিনিট পর খড়খড়ে কণ্ঠে সাড়া পাওয়া গেল ওপাশ থেকে, 'হারুণ চৌহান বলছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে হবে। যারা চুরি করে দেয়াল টপকে আমার বাড়িতে ঢোকে, তাদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

'কাজল আর আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম,' কৈফিয়তের সুরে বলল কিশোর। 'অনেকবার বেলের বোতাম টিপেও যখন সাড়া পেলাম না, ভাবলাম বেল নষ্ট। গেটও বন্ধ। শেষে আর কোন উপায় না দেখে দেয়াল টপকেই ঢুকে পড়লাম। কাজটা ঠিক করিনি। মাপ করে দেবেন।'

'আমার কাছে কি চাও?' কিশোর মাপ চাওয়ার পরেও সুর নরম হলো না লোকটার।

'মজার কিছু তথ্য পেয়েছি আমি, সেগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু টেলিফোনে সেটা সম্ভব না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকার পর জবাব দিল হারুণ, 'তুমি জানো আমি অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকি।'

'জানি। বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার। প্লীজ! আপনার সঙ্গে আমাদের কথা বলাটা জরুরী।'

'বেশ, তাহলে আগামী সপ্তায়।'

দমে গেল কিশোর। এতদিন অপেক্ষা করা কঠিন। 'দেখুন, কালকে করা যায় না? খুব জরুরী।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। হারুণ বলল, 'এত তাড়াহুড়া কেন?'

'সেটা সামনাসামনি বলব। আপনি আমাদেরকে কয়েক মিনিট সময় দিন। আগামীকাল, এই ন'টা নাগাদ?'

'ন'টা! এত দেরি! জানো, ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠি আমি। আমার শ্রমিকরা কাজ শুরু করে কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায়।'

'বেশ, তাহলে আপনার যখন সুবিধে হয়।'

নাছোড়বান্দা কিশোরকে এড়াতে না পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো হারুণ। 'ঠিক আছে, সকাল আটটায়। দেরি করবে না কিন্তু। আটটা মানে আটটা।'

ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। হারুণের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবরটা কাজলকে জানাতে ছুটল।

'রাজি তাহলে পারলে করাতে!' খুশি হলো কাজল। 'আটটা বাজার আগেই গিয়ে বসে থাকব আমরা। যাতে কোন ছুতোয়ই আমাদের খসাতে না পারে। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, লোকটা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে সত্যি রাজি হয়েছে!'

হাসল কিশোর। 'হয়েছে। তার সঙ্গেই কথা বলেছি আমি, কোন সন্দেহ নেই।'

রাতে সেদিন সকাল সকাল শুয়ে পড়ল দু'জনে পরদিন যাতে খুব ভোরে ঘুম ভাঙে। হারুণের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কোনমতেই মিস না হয়।

সকালবেলা আটটা বাজার পনেরো মিনিট আগে হারুণের বাড়িতে পৌঁছাল ওরা। বেলের বোতাম একবার টিপতেই খুলে দেয়া হলো গেট। বাড়ির সদর দরজা খুলে দিল একজন লোক। জানাল, নাস্তা খেতে বসেছে তার সাহেব। পরস্পরের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর আর কাজল। আগের দিন এত বড় বড় কথা বলেছে হারুণ, ছ'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এত দেরিতে নাস্তা কেন?

লোকটা ওদের বসিয়ে রেখে চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হলো খামারের মালিক। হাসলও না। হাতও মেলাল না। বরং গর্জে উঠল, 'তোমাদেরকে আমি ঠিক আটটার সময় আসতে বলেছিলাম। আগে আসতে তো বলিনি।'

কাজল বলল, 'কাজ থাকলে সেরে আসুন না। আমরা বসি।'

কিশোর বুঝে গেছে, ধমক দেয়া, অকারণ চাপে রাখা লোকটার স্বভাব। চুপ করে রইল সে।

কাজলের কথায় রেগে উঠতে গিয়েও উঠল না হারুণ। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড চুপচাপ দেখল দুই কিশোরকে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, অপেক্ষা করা আর লাগবে না। তবে তাড়াতাড়ি শেষ করবে। আমার সময় নেই।'

কোন রকম ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে কিশোর বলল, 'খান সাহেবের কাছে পার্চমেন্টে আঁকা যে ছবিটা আপনি বিক্রি করেছেন, সেটার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। ওটা কি মিয়ানমার থেকে এনেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হারুণ। 'নিলামে কিনেছিলাম।'

'ছবিটা সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

'জানিই না কিছু, কি বলব। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলাম কিছুদিন। দেখতে দেখতে যখন একঘেয়ে হয়ে গেল, ভাবলাম কেউ কিনতে চাইলে বেচে দেব। খান সাহেব আগ্রহী হলেন। জহুরী জহর চেনে। নিয়ে গিয়ে ভালই করেছেন।'

'আচ্ছা, ছবির ফ্রেম খুলে পেছনটা কখনও দেখেছেন?'

কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হারুণ। 'না। কেন?'

'আপনার কি একবারও মনে হয়নি ছবিটা কে এঁকেছে, পেছনে তার নামটাম সই করা আছে কিনা, দেখি?'

'না। আছে নাকি? তুমি দেখেছ?'

চট করে কাজলের দিকে তাকাল একবার কিশোর। তারপর জবাব দিল, 'দেখেছি।'

হঠাৎ করেই যেন প্রশ্নবোমা ফাটানো শুরু করে দিল হারুণ, 'ছবিটার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমাদের? গোলমেলে কিছু চোখে পড়েছে নাকি? কিনে এখন আফসোস হচ্ছে খান সাহেবের? ফিরিয়ে দিতে চাইছেন?'

থামল হারুণ। তবে খুব সামান্য সময়, দম নেয়ার জন্যে। তারপর আবার শুরু করল, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমারই বাড়িতে ঢুকে আমাকেই এভাবে জেরা শুরু করেছ কেন তোমরা? নিশ্চয় সেটা জানার অধিকার আমার আছে?'

লোকটার এই হঠাৎ উত্তেজনা অবাক করল কিশোরকে। 'আপত্তিকর কোনও

প্রশ্ন করে থাকলে দুঃখিত।' তার মাথায় ঢুকল না কি এমন খারাপ কথা বলে ফেলেছে সে। 'ছবিটা ছাড়া আর কোন ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই।'

শুনে সাময়িক শান্ত হলো হারুণ।

তার রাগ কমানোর জন্যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কাজল, 'আঙ্কেল, আন্টি নেই বাড়িতে?'

'না! বিয়ে করিনি!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হারুণ। বুঝিয়ে দিল, সাক্ষাৎকারের সময় শেষ।

আর কিছু বলার সাহস পেল না কিশোর বা কাজল। আড়ষ্ট পায়ে এগোল সামনের দরজার দিকে। পেছন পেছন এল হারুণ। ওরা বাইরে বেরোতেই দরজা লাগিয়ে দিল দড়াম করে।

গেটের বাইরে এসে স্ট্যান্ড থেকে মোটর সাইকেলটা নামাল কাজল। 'হারুণ এ রকম খেপে গেল কেন হঠাৎ বুঝলাম না। শুধু শুধু এসে কষ্ট করলাম। ছবির ব্যাপারে তেমন কিছুই কিন্তু বলল না।'

'আমার মনে হলো, কথা লুকিয়েছে হারুণ চৌহান। অনেক কিছুই জানে সে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'কিন্তু সেগুলো বের করব কিভাবে তার পেট থেকে? আর তার সামনে যেতে পারব না। ওরিব্বাপরে!'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'মোটর সাইকেলটা ওই খেতের কোনায় রাখো। ওই যে সব্জী খেতে কাজ করছে লোকগুলো, ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

সবচেয়ে কাছের লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। একমনে কাজ করে যাচ্ছে লোকটা। মুখ তুলল না। হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কেমন আছেন?'

চুপ করে রইল লোকটা। কিশোরের হাসির জবাবও দিল না, কথার জবাবও দিল না। অবাক লাগল তার। কালা নাকি লোকটা? কানে শোনে না? আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন?'

এবারও জবাব নেই। কাজ করেই চলেছে লোকটা।

জেদ চেপে গেল কাজলের। লোকটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কানে শোনে না মনে করে কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে ভাই, আপনার নাম কি?'

অবশেষে মুখ তুলল লোকটা। ভাঙা ভাঙা বাংলায় জবাব দিল, 'বাংলা জানি না!'

ওর কথা না বলার রহস্যটা ভেদ হলো এতক্ষণে। লোকটা বার্মিজ।

খানিক দূরে কাজ করছে আরেকটা লোক। তার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। এই লোকটাও বার্মিজ। প্রথম লোকটার মতই এর কাছেও জবাব

পাওয়া গেল, বাংলা জানে না।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কাজল। 'এখানে তো দেখা যাচ্ছে কথা বলার বড়ই সমস্যা। যে বাংলা জানে, সে কিছু বলতে চায় না, কথা লুকায়। আর যে বলতে চায়, সে বাংলাই জানে না। মিছে কথা বলছে না তো?'

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে একটা ছেলের দিকে। হাত তুলে দেখাল কাজলকে। 'বুড়োগুলোর মনের হদিস পাওয়া কঠিন। ঘোরপ্যাঁচ বেশি। বাংলাদেশে থাকে, অথচ একেবারেই বাংলা জানে না, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। চলো, ওই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে দেখি। ও হয়তো মুখ খুলতে পারে।'

গাছের নিচে বসে ছবি আঁকছে একটা ছেলে। বয়েস বছর দশেক হবে। সুন্দর চোখ দুটোতে কিছুটা বার্মিজ ছাপ। ওর সামনে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা।

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। কিছু বলল না।

'বাংলা জানো?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'কিছু কিছু।'

'কোন্ ভাষায় কথা বলো তোমরা?'

'বার্মিজ।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তাড়াতাড়ি রঙ-তুলি-কাগজ সব লুকিয়ে ফেলে একটা নিড়ানি তুলে নিয়ে ঘাস সাফ করতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, 'পালাও!'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।

ওদের নড়তে না দেখে ইশারা করল ছেলেটা। ফিরে তাকিয়ে ওরা দেখল, হারুণ চৌহান আসছে।

'চলো, চলো!' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল কাজল।

কিশোরও দ্বিরুক্তি করল না। মাথা ঝাঁকিয়ে কাজলের কথায় সায় জানিয়ে চৌহান যেদিক থেকে আসছে তার উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করল। অনেক দূর দিয়ে ঘুরে এসে রাস্তায় উঠে মোটর সাইকেলের কাছে পৌঁছল।

ফেরার পথে কিশোর বলল, 'অরুণের এই বার্মিজ বলা একটা অতি মূল্যবান সূত্র দিয়েছে আমাকে।'

'ওর নাম অরুণ, তুমি জানলে কি করে?' কাজল অবাক।

'ওর গেঞ্জিতে নাম লেখা দেখেছি। সব ক'জন শ্রমিকের একই রকম গেঞ্জি পরা, খেয়াল করোনি? গেঞ্জির বুকের কাছে নাম লেখা। সবারই।'

'আমি খেয়ালই করিনি,' সশ্রদ্ধ প্রশংসা কাজলের হাসিতে। 'এ জন্যেই তুমি কিশোর পাশা, গোয়েন্দা; আর আমি কাজল খান, বোকার হদ্দ।'

'অকারণে নিজেকে গালমন্দ করছ। তুমিও বোকা না। এ সব কাজে

অভিজ্ঞতা কম।'

কাজলদের খামারে ঢুকেই মামাকে ফোন করতে ছুটল কিশোর।

'কি খবর তোর, কিশোর?' আরিফ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন। 'তোর তদন্ত কদ্দূর?'

'খুব একটা এগোতে পারিনি,' কিশোর বলল। 'একটা কাজ করতে পারবে, মামা?'

'বলে ফেল।'

'ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে জানতে পারবে ওদের বছর দশেক আগের ফাইলে হারুণ চৌহান নামে কোন লোকের বাংলাদেশে ঢোকার রেকর্ড আছে কিনা? লোকটার সম্ভবত মায়ানমারের নাগরিকত্বও আছে।'

এ ক'দিনে তদন্ত করে যা যা জেনেছে মামাকে জানাল কিশোর।

'অনেকখানিই তো এগিয়েছিস। পারিনি বলছিস কেন?' আরিফ সাহেব বললেন। 'ঠিক আছে, ইমিগ্রেশনে খোঁজ নিচ্ছি আমি। জানাব তোকে।'

সাত

ফোন শেষে আবার রহস্যময় ছবিটা নিয়ে বসল কিশোর আর কাজল। খানিকক্ষণ মাথা ঘামাল দু'জনে। হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল কিশোরের চোখ, 'কাজল, একটা কথা ভাবছি আমি!'

মুখ তুলে তাকাল কাজল।

'আমার মনে হয়,' কিশোর বলল, 'ছবিটার ব্যাপারে যা যা বলেছে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে হারুণ। ছবির পেছনে লেখা ইংরেজি "এ" অক্ষরটা অরুণ নামের আদ্যক্ষর।'

কুঁচকে গেল কাজলের ভুরু। 'তুমি বলতে চাও, ছবির এই বাচ্চাটিই বড় হয়ে কাজ করছে এখন হারুণের খামারে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ভাবনাটা হয়তো অদ্ভুত। কিন্তু অসম্ভব না।'

'অদ্ভুত তাতে কোন সন্দেহ নেই,' কাজল বলল। 'কিন্তু তোমার অদ্ভুত ভাবনার ওপরও আমার বিশ্বাস জন্মে গেছে।'

ঘরে ঢুকলেন খান সাহেব। কিশোরের নতুন ধারণাটার কথা জানানো হলো তাঁকে। হাসলেন তিনি। তবে সম্ভাবনাটা যে উড়িয়ে দেয়া যায় না, এ কথাও স্বীকার করলেন।

কাজল বলল, 'ছবিতে পেছন ফিরে আছে যে লোকটা, সে অরুণের বাবা না

তো? কিন্তু পেছন ফিরে আছে কেন সে? আর্টিস্ট কি তার মুখের দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিল?'

'কিংবা দুঃখ পাচ্ছিল,' জবাব দিলেন খান সাহেব। 'অথবা লোকটাকে পছন্দ করে না আর্টিস্ট, তাই এ ভাবে পেছন ফিরিয়ে রেখে নিজের ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, শিল্পী চায়নি চেহারা দেখে মানুষ তাকে চিনে ফেলুক।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'আর কিছু আন্দাজ করতে পারছ?'

'আপাতত না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে অরুণ আর হারুণ চৌহান সম্পর্কে বিস্তারিত আরও জানা দরকার।'

খান সাহেব জানালেন, অরুণকে সবাই হারুণের ভাতিজা বলেই জানে। ছেলেটার বাবা-মা নেই, মারা গেছে।

'এ থেকে আরেকটা জিনিস অনুমান করতে পারছি,' কিশোর বলল। 'শেষ ছবিটাতে দেখানো হয়েছে একটা নৌকাকে গুঁতো মেরেছে একটা স্টীমার। হতে পারে, ওই বোট অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছে অরুণের বাবা-মা।'

'তোমার অনুমানটা উড়িয়ে দেয়া যায় না,' খান সাহেব বললেন। 'একটা কথা ভাবছি, ছেলেটাকে বৈধভাবে দত্তক নিয়েছেন তো চৌহান?'

'জানার জন্যে হয়তো মায়ানমারেই যেতে হবে,' হাসল কাজল। 'কিশোর, ক্রমেই কিন্তু কাছিয়ে আসছে দেশটা। শেষ পর্যন্ত ওখানেই না পাড়ি জমাতে হয় আমাদের।'

'লাগলে তো যাবই,' কিশোর বলল। 'কিন্তু মনে হয় না যাওয়া লাগবে। আশা করি এখানে, এই ভেড়ার খামারে বসেই কাহিনীর ইতি টানতে পারব আমি।'

কাজল আর তার বাবা, দু'জনেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। কাজল বলল, 'কিশোর, কিছু একটা আছে তোমার মনে, অদ্ভুত আরও কোন ভাবনা। কি, ঠিক বলিনি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'বলেছ। সত্যিই আরেকটা অদ্ভুত ভাবনা মাথায় ঘুরছে আমার। নিলাম থেকে হারুণের ছবি কেনার কথাটা সত্যি বলে মেনে নিতে পারছি না আমি। বেচারা অরুণের কথাও ভাবছি। ছবি আঁকায় দারুণ হাত ওর। একই রকম হাত পার্চমেন্টে আঁকা ছবিগুলোর আর্টিস্টেরও, যার নামের আদ্যাক্ষর লেখা রয়েছে ছবির পেছনে। আমার বিশ্বাস, ওই আর্টিস্টের সঙ্গে অরুণের রক্তের সম্পর্ক আছে। ওর পুরো নাম জানেন, আঙ্কেল? পদবীটা?'

'না,' খান সাহেব বললেন। 'তবে হারুণ চৌহানের আপন ভাতিজা হলে ওর পদবীও চৌহানই হবে। "এস সি" দিয়ে কি হয় জানাটা এখন সত্যি জরুরী। ওটা কোন ব্যক্তির নামের আদ্যাক্ষর না হয়ে কোন আর্ট স্কুল, মিউজিয়াম কিংবা যে ডিলার ওটা বিক্রি করেছে, তার নামের আদ্যাক্ষরও হতে পারে।'

আরও দু'চারটা কথা বলে উঠে চলে গেলেন খান সাহেব।

কাজল জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করব?'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'এক কাজ করা যাক। চলো ওহাব বুড়োর সঙ্গে কথা বলে আসি। সেদিন যে লোকগুলো ওকে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছিল, ওরা আর এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করব। চৌহানের ব্যাপারেও কিছু জানা থাকতে পারে তার।'

'ভাল বুদ্ধি। ঠিক আছে, চলো।'

ঝুপড়ির সামনে গাছের শিকড়ে বসে থাকতে দেখা গেল ওহাবকে। চারপাশে ভেড়ার পাল। কোনটা চরছে, কোনটা শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। বুড়োর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর একটা ভেড়ার ছানা। ওটাকে আদর করছে সে। বিড়বিড় করে কথা বলছে।

গোয়েন্দাদের দেখে খুশি হলো ওহাব। 'আসো, আসো। মনে হইতাছিল তোমরা আইজ দেখা করতে আসবাই।'

হাসল কিশোর। বাচ্চাটাকে দেখাল। 'কি কথা বলছিলেন?'

'ওর লগে না, আমার পীরের লগে,' ওহাব বলল। 'হুজুরে আমারে উপদেশ দিতাছিলেন। সেইড়াই মুখস্থ করতাছিলাম।'

'কই, কোথায় আপনার পীর?' অবাক হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। কাউকে দেখতে পেল না। অথচ দূর থেকে স্পষ্ট দেখেছে, কারও সঙ্গে কথা বলছিল বুড়ো। ওরা ভেবেছে বাচ্চাটার সঙ্গে বলছে।

'তিনি তো দুনিয়ায় নাই। আড়াল হইয়া গেছেন,' শ্রদ্ধাভরে আকাশের দিকে আঙুল তুলল ওহাব। মাথাটা সামান্য নুইয়ে সালামের ভঙ্গি করল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি উপদেশ দিচ্ছিলেন আপনার পীর?'

'তিনি কইলেন: দেখো ব্যাটা, কেউ যদি তোমার কাছে জরুরী কিছু কইতে আসে, মন দিয়া শুনবা। বলা তো যায় না কিসের মদ্যে কি লুকাইয়া আছে।'

'আমার মধ্যে অন্তত কিছু নেই,' হাত নেড়ে বলে দিল কাজল। 'তবে ওহাবচাচা, তোমার সঙ্গে যে জরুরী কথা বলতে এসেছি, সেটা ঠিক।'

'বইলা ফালাও।'

'সেই গুণ্ডা দুটো কি আবার এসেছিল?'

'না।'

ওদের ব্যাপারে এখনও কথা বলতে নারাজ কিনা বুড়ো, জানতে চাইল কিশোর।

'শুধু আমার নিজের কথা হইলে ভয় পাইতাম না,' ওহাব বলল, 'বইলা ফালাইতাম। কিন্তু আমি কইলে অনেক ভুলাভালা মানুষ বিপদে পড়ব।'

চৌহানের কথা জানতে চাইল তখন কিশোর।

খান সাহেব যা যা বলেছেন, সেটারই পুনরাবৃত্তি করল ওহাব। সেইসঙ্গে যোগ করল, 'আর কিছু জানি না আমি। বদমেজাজী লোকডার লগে কতা কইতেও ডর

লাগে। অর একটা কামলাও বাংলা জানে না। বর্মী কতা কয়। মানুষগুলানরে খাডাইতে খাডাইতে জান বাইর কইরা ফালায়। লোকডার দিলে দয়ামায়া বলতে কিছু নাই। ছোট্ট পোলাডা যে থাহে অর বাড়িত, খামাখা খামাখা ওইডারে ধইরা পিডায়। মাইনষেরে কয় পোলাডা অর ভাতিজা, আমি বিশ্বাস করি না। পোলাডার লগে চেহারারও মিল নাই। বর্মী বর্মী চেহারা পোলাডার।'

'ওইটুকুন ছেলেকে মারে? লোকটা আসলেই খুব খারাপ,' কিশোর বলল।

আর বিশেষ কিছু জানাতে পারল না ওহাব। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারণভূমির দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। অনেকগুলো ভেড়া চরছে ওখানে। বিশাল একটা মর্দা ভেড়া দেখিয়ে কিশোরকে বলল কাজল, 'ভীষণ বদমেজাজী ওটা। আমরা ওকে এড়িয়ে চলি।'

হাঁটা থামাল না ওরা। তবে একটা চোখ রেখেছে ভেড়াটার ওপর। ভেড়াটাও কুটিল চোখে দেখতে লাগল ওদের। মাথা ঝাড়া দিল। বড় বড় বাঁকানো শিং দুটো নামিয়ে আচমকা ছুটে আসতে শুরু করল ওদের দিকে।

'আরে, সত্যিই গুঁতো মারতে আসছে দেখি!' চেঁচিয়ে উঠল কাজল, 'কিশোর, দৌড় দাও! দৌড়!'

ঝেড়ে দৌড় দিল দু'জনে। ভেড়াটার গতি ওদের চেয়ে দ্রুত। আগে আগে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওরা। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। খামারের নয়। বাইরে থেকে ঢুকেছে।

'এবার থামবে,' আশা করল কিশোর।

'কুকুরকে ভয় পায় না ওটা,' কাজল বলল। 'একটা বাঘা কুত্তাকে একদিন গুঁতিয়ে মেরেই ফেলেছিল আরেকটু হলে।'

কিভাবে বাঁচা যায়, ছুটতে ছুটতে ভাবছে কিশোর। কোন উপায় দেখতে পেল না।

বিপদের ওপর বিপদ। কুকুরের চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে বড় একটা ভেড়া ছুটে এসে পড়ল একেবারে কিশোরের সামনে। লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

কাছে চলে এল বদমেজাজী ভেড়াটা। বাঁকা শিংওয়ালা মাথাটা পেটের নিচ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, টের পেল কিশোর।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে তার মগজে। কি করবে ভেড়াটা? ওকেও বাঘা কুকুরটার মত শূন্যে ছুঁড়ে দেবে? নাকি গুঁতিয়ে পাঁজর ভাঙবে?

শূন্যে ছুঁড়ে দেয়ারই মতলব করেছে ভেড়াটা। মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। টারজান হলে এখন দুই হাতে দুই শিং চেপে ধরে লড়াই শুরু করে দিত। কিন্তু সে টারজান নয়। লড়াইয়ের চেষ্টাও করল না। বরং দুই হাতে একটা শিং চেপে ধরে ঝুলে পড়ল।

ভীষণ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকল ভেড়া। প্রচণ্ড জোরে ঝাড়া মেরে মেরে কিশোরকে শিং থেকে ছুটানোর চেষ্টা করতে লাগল। নাড়া খেয়ে একবার এদিকে যাচ্ছে কিশোরের দেহ, একবার ওদিকে। কিন্তু শিং ছাড়ল না সে।

ভেড়াটা ওকে ছুটানোর চেষ্টা করে করে এক সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। ক্লান্ত, নাকি পরাজিত? জবাবটা যা-ই হোক, সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিশোর। সতর্ক চোখ রাখল বদমেজাজী প্রাণীটার ওপর।

দৌড়ে এল কাজল। 'বলেছিলাম না সাংঘাতিক শয়তান!'

কিন্তু শয়তান হলেও কাজলকে চেনে প্রাণীটা। তাই ওকে আক্রমণের চেষ্টা করল না। পেছনে থাবা মেরে ওটাকে তাড়িয়ে দিল কাজল।

মনে হলো গেছে, কিন্তু গেল না ভেড়াটা। মেজাজ এখনও খাপ্পা হয়ে আছে। কিছুদূর গিয়েই ঘুরে আবার শিং বাগিয়ে তেড়ে এল। ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ আদেশের সুর চাবুকের মত শপাং করে আছড়ে পড়ল যেন।

আবদুল ওহাবের ধমক খেয়ে থমকে দাঁড়াল ভেড়াটা। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর আবার আসতে শুরু করল। একটা আজব কাণ্ড ঘটল এই সময়। সুরেলা উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল ওহাব। আধ্যাত্মিক গান। গানের সুর মুহূর্তে বিস্ময়কর ক্রিয়া করল ভেড়াগুলোর ওপর। প্রভাবিত হয়ে পড়ল ওগুলো। পাজি ভেড়াটা দাঁড়িয়ে গেল রাগ ভুলে গিয়ে। অন্য ভেড়াগুলোও খাওয়া ভুলে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল গায়কের দিকে। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়তে লাগল বাচ্চাগুলো।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। বাজনার সুর ভেড়াকে প্রভাবিত করেছে, ইয়োরোপিয়ান রাখালদের কাছে শুনেছে সে। কিন্তু গানও যে ওদের প্রিয়, এই প্রথম দেখল।

পাজি ভেড়াটাকে থামিয়ে দিয়ে বাঁচানোর জন্যে ওহাবকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।

হাসল ওহাব। 'সবই আল্লাহর ইচ্ছা! আমার হুজুরে কইতেন: সব সময় গান গাইবা। গানের সুর অতিবড় পাষণ্ডের দিলেও রহম পয়দা করে।'

কথাটা অস্বীকার করতে পারল না কিশোর। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কাজলের সঙ্গে বাড়ি রওনা হলো।

আট

চিন্তিত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কাজলের দিকে তাকাল। 'এমন কাউকে চেনো, যে বার্মিজ জানে?'

'চিনি। কেন?'

'তাকে আসতে বলতে পারবে? হারুণের খামারের লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলাতাম।'

হেসে উঠল কাজল। 'আবার চালু হয়ে গেছে গোয়েন্দা মগজ। ভেড়ার সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনাটা এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেলে? হ্যাঁ, পারব। আমি বললেই চলে আসবে তরিক। ওই যে বলেছিলাম, আমার বন্ধু।'

বাড়ি ফিরেই তরিককে ফোন করল কাজল। বাড়িতেই পাওয়া গেল ওকে। সামনে পরীক্ষা। পড়ায় ব্যস্ত। তরিক বলল, 'কোনমতে পারি আর কি। বার্মায় গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকেছিলাম কিছুদিন। দু'চারটা শব্দ তখনই শিখেছি।'

'কাজ চালাতে পারবে তো?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'তা ঠিক। কখন আসতে পারবে তুমি?'

'আগামী কাল হলে চলবে?'

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল কাজল। তারপর তরিকের কথার জবাব দিল, 'চলবে।'

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ কাজলদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেল তরিক। লম্বা ছেলেটাকে একনজরেই পছন্দ হয়ে গেল কিশোরের। কিশোরকেও পছন্দ করল তরিক। বন্ধুত্ব হতে দেরি হলো না।

তরিককে নিয়ে হারুণের খামারে গেল আবার কিশোর আর কাজল। তরকারীর খেতে কর্মরত বর্মী লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালাল তরিক। যদিও বর্মী শব্দের ভাণ্ডার খুবই কম তরিকের, কিন্তু তার কথা বুঝল না লোকগুলো, এটা বলা যাবে না।

অরুণের সঙ্গেও দেখা হলো ওদের। আগেরবারের মতই এবারও আগ্রহ নিয়ে কথা বলল সে। জানা গেল, সেদিন কিশোর আর কাজলের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে তাকে অনেক মেরেছে তার চাচা। ছবি আঁকার সমস্ত সরঞ্জাম নষ্ট করে দিয়েছে। কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ মুছতে মুছতে অরুণ জানাল, জিনিসগুলো তাকে একজন বর্মী শ্রমিক কিনে দিয়েছিল।

ভাগ্য খারাপ অরুণের, সেদিনও কিশোরদের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখে ফেলল হারুণ। তেড়ে এল। শাসাতে লাগল গোয়েন্দাদের। বেরিয়ে যেতে বলল। হুমকি দিল, আবার যদি কোনদিন ওদের এখানে ঢুকতে দেখে সে, ভাল হবে না।

হারুণের ব্যবহারে কিশোর আর কাজলের মত তরিকও খেপে গেল তার ওপর। কিশোরদেরকে তদন্ত চালিয়ে যেতে বলল সে। সাধ্যমত ওদের সহায়তা করে যাবে সে।

বাড়ি ফিরে এল কিশোর ও কাজল। এরপর কি করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনায় বসল। কাজল বলল, 'আরিফ-আঙ্কেল যে বলেছিলেন, অসীম দেবনাথের সাহায্য নিতে। তাঁকে একবার ফোন করে দেখলে কেমন হয়?'

'কি লাভ? মামা বলেছিল, তাঁর কাছে ছবির ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ছবি রহস্যের সমাধান তো মোটামুটি করেই ফেলেছি আমরা।'

'হুঁ। তা-ও তো বটে। তাহলে কি করবে এখন? আর কোন কাজ না থাকলে চলো, ভেড়ার বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করিগে।'

'তা-ই চলো। কাজ করতে করতে ভাবব।'

দুপুরের খাওয়ার পর আবার বেরোল ওরা। মোটর সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে ওদের খামার দেখাল কিশোরকে কাজল।

কেটে গেল দিনটা। কিশোরের মনে হলো ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। কখন যে শুতে যাবার সময় হয়ে এল, টেরই পেল না। বাতি নিভিয়ে দিল কাজল। নিঝুম হয়ে এল পুরো বাড়িটা।

কাজল ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কিশোর জেগে রইল। কিছুতেই ঘুম আসছে না তার। রহস্যটা নিয়ে ভাবছে। বার বার ভাবনাটা চলে যাচ্ছে অরুণের দিকে। কেবলই মনে হচ্ছে ছেলেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হারুণের কাছ থেকে সরানো দরকার। নইলে কোনদিন মারতে মারতে মেরেই ফেলে নিষ্ঠুর লোকটা, কে জানে।

যতই ভাবছে, ঘুম ততই দূরে সরে যাচ্ছে। নাহ্, এ ভাবে গড়াগড়ি করে লাভ নেই। শেষে 'ধ্যাত্তোর!' বলে উঠেই পড়ল বিছানা ছেড়ে। স্যান্ডেল জোড়া পায়ে গলিয়ে টেবিলের ওপর রাখা টর্চটা তুলে নিয়ে নিচতলায় চলল। ছবিটা দেখবে। দেখে বোঝার চেষ্টা করবে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা।

কাউকে বিরক্ত না করে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে। হলঘরে এসে সুইচ টেপার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় আলো চোখে পড়ল। পাতলা একফালি আলো নড়ে বেড়াচ্ছে ঘরে। কাউকে চোখে পড়ল না। কিন্তু কারও হাতে না থাকলে আলোটা ওভাবে নড়তেও পারত না।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে আলোর আড়ালে আবছা মানুষটার অবয়ব অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল তার। আলোটা পেনলাইটের। লোকটার হাতে ধরা। অবশেষে আলোর নড়া বন্ধ হলো। স্থির হলো পার্চমেন্টে আঁকা ছবির ওপর।

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে কিশোরের। বাড়ির কেউ? তাহলে চুরি করে এ ভাবে টর্চ জেলে ছবি দেখতে আসবে কেন? তারমানে চোর। তার সন্দেহ প্রমাণিত হলো যখন ওপর দিকে তুলে ধরা টর্চের আলো নড়ে উঠে ক্ষণিকের জন্যে লোকটার মুখটা চোখে পড়ে গেল তার। নাইলনের মোজা মাথার ওপর দিয়ে টেনে

মুখের ওপর দিয়েছে। চেহারা চিনতে না দেয়ার সহজ কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা।

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। নিঃশ্বাসও ফেলছে না। আচমকা হাত বাড়িয়ে ছবিটা নামিয়ে আনল আগন্তুক।

আর চুপ করে থাকা যায় না। চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'ও কি! ছবি নিচ্ছেন কেন?'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ছবিটা ছুঁড়ে মারল কিশোরকে সই করে। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল কিশোর। অল্পের জন্যে মুখে লাগল না। দরজায় গিয়ে বাড়ি খেল। ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

মরিয়া হয়ে আলোর সুইচটা হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। পাচ্ছে না কিছুতেই। ঠিক তার মুখ সই করে টর্চের আলো ফেলল লোকটা। চোখে আলো ফেলে অন্ধ করে দিল কিশোরকে।

লাফিয়ে উঠল চোরটা। দৌড়ে এল। নিচু হয়ে তুলে নিল ছবিটা। সামনের দরজার দিকে ছুটল।

'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে উঠল কিশোর। লোকটার শার্ট খামচে ধরল। কিন্তু রাখতে পারল না। হ্যাঁচকা টানে তার হাতটা ছুটিয়ে একদৌড়ে বাইরে চলে গেল লোকটা।

তাড়া করল কিশোর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে 'চোর চোর' বলে। উত্তেজিত কথা শোনা গেল। আলো জ্বলে উঠতে লাগল একের পর এক। দৌড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরোল কিশোর। কিন্তু চোরটাকে দেখল না কোথাও।

আশফাক সাহেব, তাঁর স্ত্রী, কাজল, বাড়ির আরও লোকজন উঠে চলে এল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও চোরের দেখা পাওয়া গেল না।

নয়

পরদিন সকালে খবর পেয়ে পুলিশ এল। ঘুরেফিরে দেখল সব। কোন সূত্র পেল না। পুলিশ আসার আগেই খোঁজাখুঁজি করেছে কিশোরও। সে-ও কিছু পায়নি। চোরটা কে বা কোথা থেকে এসেছে কিছুই জানা গেল না।

সারাটা দিন নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করল সে আর কাজল মিলে। হারুণের খামারের কাছ থেকেও ঘুরে এল একবার। মাঠে অরুণকে দেখল না। বাড়ি থেকে বোধহয় বেরোতে দেয়নি হারুণ।

ছেলেটার জন্যে দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল কিশোরের।

বাড়ি ফিরে এলে কাজলের আম্মা বললেন, 'কিশোর, তোমার মামা ফোন

করেছিলেন। তোমাকে বলতে বলেছেন বাড়ি এসেই যেন ফোন করো। জরুরী খবর আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ফোন করল কিশোর। আরিফ সাহেবই ধরলেন। কিশোর কেমন আছে, তদন্তের অগ্রগতি কি রকম, জানতে চাইলেন। তারপর বললেন, 'তোর মামী তো তোর জন্যে অস্থির হয়ে আছে। তোদের বিপদের ভয়ে।'

হাসল কিশোর। 'না, কি আর বিপদ। মামীকে বোলো আমি ভালই আছি। জরুরী খবর আছে নাকি বলেছিলেন?'

'ইমিগ্রেশনে খবর নিয়েছি,' আরিফ সাহেব বললেন। 'বছর দশেক আগে মায়ানমার থেকে হারুণ চৌহান নামে কোন লোকের বাংলাদেশে আসার রেকর্ড নেই ওদের খাতায়।'

'সে আমি জানতাম,' বিন্দুমাত্র হতাশ হলো না কিশোর, 'বরং এটাই আশা করেছিলাম। শিশু অরুণকে নিয়ে চোরাপথে বেআইনীভাবে বাংলাদেশে ঢুকেছে হারুণ। তার বার্মিজ শ্রমিক আর সহকারীরাও একই ভাবে ঢুকেছে।'

'হুঁ,' আরিফ সাহেব বললেন, 'কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়া তো ধরা যাবে না লোকটাকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। নতুন কোন অগ্রগতি হলে জানাস আমাকে।'

'নতুন আরেকটা খবর আছে,' কিশোর বলল। 'ছবিতে আরেকটা নামের আদ্যক্ষর পাওয়া গেছে। এস সি। পুরো নামটা কি হবে জানি না। তবে হারুণের সঙ্গে জড়িত কারও কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের নাম হতে পারে। আরেকবার খোঁজ নিতে পারবে ইমিগ্রেশনে? এস সি নামটা যদি কোন মানুষের হয়, তাহলে জানতে হবে মায়ানমার থেকে ওই নামের কেউ দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ঢুকেছিল কিনা। কিংবা এখনও বাস করে কিনা। হারুণ চৌহানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। পারবে?'

'চেষ্টা করব,' আরিফ সাহেব বললেন। 'মায়ানমারেও লোক আছে আমার। সেখানেও খোঁজ নেব। দেখা যাক, কোনখান থেকে কি খবর বেরোয়। এখন তোর জন্যে আরেকটা চমক আছে। সেই যে মহিলাকে তোরা তাড়া করেছিলি না, যে জিনার জ্যাকেটটা নিয়ে পালাচ্ছিল, তাকে ধরেছে পুলিশ। সব স্বীকার করেছে সে। হারুণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ চোর। স্বামী পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়ে আছে। লেখাপড়া বিশেষ জানে না। চাকরি-বাকরি জোগাড় করতে পারেনি। শিশু সন্তান আর নিজেদের খাবার জোগাড়ের জন্যে শেষে এক পরিচিত ড্রাইভারকে হাত করে চুরি শুরু করেছে। ভদ্র পোশাক পরে থাকে। যাতে মানুষ তাকে সন্দেহ না করে। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছিল।'

'হুঁ! দুঃখই লাগছে মহিলার জন্যে। এক কাজ করো না,' কিশোর বলল, 'কেসটা তুলে নাও না মহিলার ওপর থেকে।'

হাসলেন আরিফ সাহেব। 'তোর কি মনে হয়? এত কথা শোনার পর জেল খাটাব আমি মহিলাকে? বরং আমার এক বন্ধুকে বলে তার কারখানায় মহিলার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি।'

'খুব ভাল করেছো, মামা,' খুশি হলো কিশোর। 'রাখি তাহলে এখন?'

'আচ্ছা। খবর পেলেই জানাব তোকে।'

'আর মামীকে চিন্তা করতে মানা কোরো।'

'করলেই কি আর শোনে। আচ্ছা, রাখলাম।'

কিশোর যখন কথা বলছে, কাজল তখন গেছে তার ভেড়ার বাচ্চাগুলোর পরিচর্যা করতে। বসে বসে ভাবতে লাগল কিশোর। ঘরে ঢুকলেন খান সাহেব। 'কি ব্যাপার? ফোনটা তোমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মনে হচ্ছে?'

মামার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, খান সাহেবকে জানাল কিশোর।

'কি করবে এখন?' সব শোনার পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সূত্র যা যা ছিল, সব শেষ। দেয়ালে এসে ঠেকেছি। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি, হারুণ চৌহানের সঙ্গে এই রহস্যের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সেটা প্রমাণ করব কিভাবে?'

'দেখো, কি হয়। চিন্তা করে লাভ হবে না। সময়ই সুযোগ এনে দেবে। আমি যাই। ফ্যাক্টরিতে কাজ আছে।'

কিশোরও বেরোল। কাজল কি করছে দেখতে গেল। ভেড়া নিয়ে ব্যস্ত কাজল। তাকে আর টানল না কিশোর। কাজ করছে করুক। সে চলল ওহাবের সঙ্গে দেখা করতে।

ওখানেও সুবিধে হলো না। ওহাব তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে তার পীরের সঙ্গে কথা বলছে।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফিরে এল কিশোর। এবং তারপর থেকেই ঘটতে শুরু করল ঘটনা। ঘরে ঢুকেই ফোন বাজতে শুনল সে। ধরল গিয়ে। ভেসে এল তরিকের উত্তেজিত গলা, 'কে, কাজল?'

'আমি কিশোর।'

'একটা খবর আছে। অরুণ পালিয়েছে।'

মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোরও। 'তুমি কি করে জানলে?'

'আমার বর্মী ভাষা ঝালাই করার জন্যে আবার গিয়েছিলাম হারুণ চৌহানের খামারে। মাঠের লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ওখানেই শুনে এলাম।'

'সত্যি পালিয়েছে? হারুণ ওকে মেরেটেরে ফেলেনি তো?'

'কি করে বলব?' জবাব দিল তরিক। 'তবে সে যে বাড়ি নেই, এটুক শিওর।'

'বড়ই চিন্তার বিষয়। খোঁজ লাগাতে হয়।'

'লাগাও। আমার কোন সাহায্য দরকার হলে ফোন কোরো।'

'করব.' বলে তরিককে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ছুটে বেরোল বাইরে। সোজা চলে এল কাজলের কাছে। তাকে দুঃসংবাদটা জানাল। শুনে কাজলও চিন্তিত হয়ে পড়ল। ন্যাকড়া দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'চলো, আব্বাকে গিয়ে জানাই।'

খোঁয়াড় থেকে বেরোল দু'জনে। ফ্যাক্টরির দিকে এগোল। এই সময় ছুটে আসতে দেখল ওহাবকে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোমরা এইখানে। তোমাদের কাছেই আসতাছিলাম। সাংঘাতিক একটা খবর আছে।'

'কি খবর?' ভুরু কুঁচকাল কাজল।

এদিক ওদিক তাকাল ওহাব। কাছেপিঠে আর কেউ আছে কিনা দেখে নিল। তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'পোলাডা পলাইয়া আমগো খামারেই আইয়া ঢুইকা পড়ছে!'

'কোন ছেলেটা?' কাজল অবাক।

'আরে ওই পোলাডা। হারুণ যারে ভাতিজা কয় আর মারে। মাইর সইহ্য করতে না পাইরা পলাইছিল। আমগো খামারে জঙ্গলের মধ্যে বইয়া বইয়া কানতাছিল। আমি আমার হুজুরের লগে কতা কইতাছিলাম। না অইলে অনেক আগেই অর ফোঁপানির শব্দ শুনতাম। গিয়া দেখি মুখচোক শুকাইয়া গেছে পোলাডার।'

'তারমানে আমি যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম,' ওহাবকে বলল কিশোর, 'তখন ও ঝোপের মধ্যেই বসেছিল!'

'কোথায় এখন ও?' চিৎকার করে উঠল কাজল। উত্তেজনা সহ্য করতে পারছে না।

'আমার ঘরে লুকাইয়া রাখছি।'

'খুব ভাল করেছ। চলো চলো।'

ওহাবের ঝুপড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল কাজল আর কিশোর।

দশ

সেদিনই আবার ফোন করলেন আরিফ সাহেব। 'তোর কথামত খোঁজ নিয়েছিলাম। এস সি কার নামের আদ্যক্ষর, শুনলে চমকে যাবি। সু চি চৌহান নামে এক মহিলা। বোট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল তার স্বামী। এর কয়েকদিন পরেই রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তার শিশুপুত্র।'

'বলো কি! খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব!' টেলিফোনেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'কোথায় এখন মহিলা? তাঁকে আসতে বলা যায় না? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব?'

'আরে আস্তে, আস্তে,' হাসি শোনা গেল আরিফ সাহেবের। 'কানের কাছে বোমা ফাটানো শুরু করলি যে। ভুলে যাচ্ছিস কেন, বহুকাল পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেছি আমি। গোয়েন্দাগিরি আর তদন্তের কাজ আমিও করেছি। হ্যাঁ, মহিলাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি আমি ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে। যে কোন সময় চলে আসতে পারেন। রেডি থাকিস। তোর কি মনে হয়, ওই মহিলাই অরুণের মা?'

'নিশ্চয়ই!' কিশোর বলল। 'তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি? তারমানে ওই মহিলা শিল্পী। ছবিটা তিনিই এঁকেছেন। বোট অ্যাক্সিডেন্টে শুধু তাঁর স্বামী, অর্থাৎ অরুণের বাবাই মারা গেছেন, যাঁর মুখটা আড়াল করে এঁকেছেন সু চি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। এখন তাহলে কি করবি?'

'এই রহস্যের যবনিকাপাত করব, আরকি। খান আঙ্কেলকে বলব, পুলিশে খবর দিতে। সু চি চৌহান জয়দেবপুরে পৌঁছলেই যাতে আসল অপরাধীকে পাকড়াও করে ফেলা যায়। হ্যাঁ, মুসা, রবিন আর জিনাকে নিয়ে তুমিও চলে এসো।'

কিশোরের পাশে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে কাজল। কিশোর রিসিভার নামাতেই প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল সে।

সব কথা তাকে খুলে বলল কিশোর।

'মিসেস চৌহান এলেই এখন সব রহস্যের সমাধান করে ফেলা যায়,' কাজল বলল। 'কিন্তু কবে আসবেন তিনি?'

এগারো

পরের দিন সন্ধ্যায়ই দলবল নিয়ে কাজলদের ভেড়ার খামারে হাজির হলেন আরিফ সাহেব। দলবল বলতে মুসা, রবিন, জিনা সবাই আছে। রাফিয়ান আসতে পারেনি। কি জানি খেয়েছে, ফুড পয়জনিং হয়ে গেছে তার। পশু হাসপাতালে রেখে আসতে হয়েছে। সেজন্যে জিনার মন খারাপ।

হাসিমুখে আরও একজন নামল গাড়ি থেকে। সুদর্শন এক যুবক। সাংবাদিক সেলিম সাহেব।

হাতটা বাড়িয়ে দিল কাজল 'সেলিমভাই, তুমিও এসেছ! খুশি হলাম।'

'আঙ্কেলের বাড়িতে গিয়েছিলাম,' আরিফ সাহেবের কথা বলল সেলিম। 'তোমাদের খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখলাম, জয়দেবপুর রওনা দিচ্ছে সবাই। আমি কি আর না এসে পারি?'

'খুব ভাল করেছ,' সেলিমের হাত ধরে আন্তরিক ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দিল কাজল।

চমকে দেয়ার মত ব্যাপার হলো, আরিফ সাহেবের সঙ্গে সু চি চৌহানও এসেছেন। খবর পেয়ে আর দেরি করেননি। পরের ফ্লাইটেই ঢাকা। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আরিফ সাহেবের বাড়ি। তিনি আসার পর আরিফ সাহেবও দেরি করেননি। ঘণ্টাখানেক পরেই রওনা হয়ে গেছেন জয়দেবপুরের উদ্দেশে।

ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কোথায় অরুণ? কোথায় আমার সোনা!'

হাত ধরে তাঁকে সোফায় বসালেন কাজলের আম্মা। শান্ত হতে বললেন।

কিন্তু সহ্য হচ্ছে না মিসেস চৌহানের। 'প্লীজ, কোথায় ও বলুন আমাকে। সব কথা খুলে বলুন।'

যতই তাঁকে শান্ত হতে বলা হলো, হলেন না মিসেস চৌহান। বরং আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠলেন। আবেগ উথলে উঠতে লাগল আরও বেশি করে। 'আমার অরুণ কতটা বড় হয়েছে? দেখতে কেমন হয়েছে?'

কিশোর বলল, 'খুব সুন্দর। আপনার সঙ্গে চেহারার অনেক মিল। আমাদের সঙ্গে যখন দেখা হলো, গাছের নিচে বসে ছবি আঁকছিল। তারমানে মায়ের গুণটাই পেয়েছে সে।'

'ওহ,' দুই হাতের তালু চেপে ধরলেন মিসেস চৌহান। আবেগে ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন একেবারে। 'কি যে ভাল লাগছে আমার! কি খুশি যে লাগছে, বলে বোঝাতে পারব না!'

কাজল জানাল, অরুণকে এ বাড়ির সীমানাতেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। 'আমাদের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে নাকি সাংঘাতিক মার মেরেছে ওকে তার চাচা হারুণ চৌহান। সব সময়ই মারে। নানা ভাবে অত্যাচার করে। সইতে না পেরে পালিয়ে চলে এসেছিল এদিকে। আমাদের কর্মচারী আবদুল ওহাব তাকে বনের মধ্যে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। হারুণের ভয়ে তার ওখানেই ওকে লুকিয়ে রেখেছি আমরা।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস চৌহান। 'কোথায় আমার সোনামণি?'

এ সময় ঘরে ঢুকলেন খান সাহেব। তিনি তো অবাক। কাজলকে বললেন, 'ইনি যে এখানে, তোরা তো আমাকে বলিসনি এ কথা!'

'বলার সময়ই পাইনি,' কাজল বলল। 'তুমি তো সেই সকাল থেকে গায়েব! তা ছাড়া কিশোর বলল, আঙ্কেল সহ সবাইকে চমকে দিলে কেমন হয়? আমি বললাম, ভাল।'

'অ, এই কাণ্ড! তা সত্যিই চমকে দিয়েছিস বটে,' খান সাহেব বললেন। 'মিসেস চৌহান, আপনি বসুন। আমি ওকে নিয়ে আসতে লোক পাঠাচ্ছি।'

বেরিয়ে গেলেন খান সাহেব। ফিরে এলেন মিনিটখানেকের মধ্যেই। শুনলেন,

মিসেস চৌহান বলছেন, 'ভয়ানক নিষ্ঠুর আর শয়তান লোক অরুণের চাচা হারুণ। জঘন্য খারাপ! অরুণের বাবা কিরণের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। বিয়ের পর থেকেই আমার ওপর কুনজর ছিল হারুণের। আমার স্বামী তার আপন ভাই। তার সঙ্গে আমাকে দেখলেও সইতে পারত না সে। ভীষণ খেপে যেত। আমাকে একদিন বলেওছিল, সুযোগ পেলেই ভাইকে খুন করবে সে। কিন্তু খুন আর তার করা লাগেনি। কপাল খারাপ কিরণের। জরুরী ব্যবসার কাজে নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার সময় তার নৌকায় গুঁতো মারে একটা স্টীমার। মারা যায় কিরণ।' গলা ধরে এল মিসেস চৌহানের। রুমাল বের করে চোখ মুছলেন।

সহানুভূতি জানিয়ে বিড়বিড় করে কি বলল মুসা, বোঝা গেল না।

'সরি!' সামলে নিয়ে মিসেস চৌহান বললেন, 'আমার পিছে লাগল তখন হারুণ। আমাকে বিয়ে করতে চাইল। কোনভাবেই যখন রাজি করাতে পারল না, প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে অরুণকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল একদিন। আলমারিতে অনেক টাকা ছিল। সেগুলোও নিয়ে গেল। তারপর থেকে কত খোঁজা যে খুঁজেছি, কোন হদিসই পাইনি ওদের।'

আবার চোখে পানি দেখা দিল তাঁর। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বললেন, 'দশ বছর পর এতদিনে খোদা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।'

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। ঘরে পিনপতন নীরবতা।

'স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন আমার মনে হলো, ছবি এঁকে ধরে রাখব পুরো কাহিনীটা,' আবার বলতে লাগলেন মিসেস চৌহান। 'পার্চমেন্টে চারটা ছবি আঁকলাম। শয়তান হারুণ ওই ছবিটাও চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'ওটা নাকি দেখুন তো?' দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে হাত তুলল কাজল।

পেছন দিয়ে বসেছিলেন বলে এতক্ষণ চোখ পড়েনি মিসেস চৌহানের। চিৎকার করে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তো! তোমরা কোথায় পেলে?'

জানানো হলো তাঁকে।

কথাবার্তা বলে কিশোর নিশ্চিত হলো সুচি চৌহানই অরুণের মা। ছদ্মবেশী নন।

খান সাহেবের দিকে তাকালেন মিসেস চৌহান। 'কোথায় ও? আসছে না কেন?'

'তাই তো!' খান সাহেব বললেন। 'এত দেরি করছে কেন?'

'কিছু ঘটেনি তো?' বলে উঠল রবিন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস চৌহান। 'চলুন চলুন! কোথায় রেখেছেন ওকে!'

আর ঠেকানো গেল না মিসেস চৌহানকে। দরজার দিকে ছুটলেন তিনি। সবাই চলল তার পেছনে।

আবদুল ওহাবের ঝুপড়িতে যাওয়ার পথে অরুণকে আসতে দেখবে আশা করেছিল ওরা, কিন্তু দেখল না। আশঙ্কাটা বেড়ে গেল কিশোরের। দৌড় দিল ঝুপড়ির দিকে।

ওখানে পৌঁছে দেখা গেল সত্যিই অঘটন। মাটিতে পড়ে আছে আবদুল ওহাব। হাত-পা বাঁধা। অরুণকে নিয়ে যেতে যে লোকটাকে পাঠিয়েছিলেন খান সাহেব, সে-ও পড়ে আছে একটু দূরে। নিশ্চয় মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছে তাকে।

অরুণ কোথায়!

কোথায় অরুণ!

চারপাশে তাকাতে শুরু করল সবাই। সবার আগে তাকে দেখতে পেল মুসা। দু'জন লোক অরুণকে টানতে টানতে নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে বনের ভেতর।

'ওই যে! ওরাই মনে হয়!' চিৎকার করে উঠে দৌড় দিল মুসা।

বাকি সবাই ছুটল তার পেছন পেছন।

এত লোক দেখে ভড়কে গেল লোকগুলো। বুঝতে পারল, অরুণকে নিয়ে পালাতে পারবে না ওরা। বরং নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়বে। ওকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়াতে লাগল ওরা।

তাড়া করে গেল তিন গোয়েন্দা আর কাজল। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে খামারের শ্রমিকদের ডাকতে লাগলেন খান সাহেব।

বন থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা গাড়িতে উঠল লোকগুলো। কিন্তু ওদের কপাল খারাপ, স্টার্ট নিল না গাড়ি। আবার নেমে দৌড় দিতে যাবে, পৌঁছে গেল গোয়েন্দারা। হাত চেপে ধরল। চারজনের বিরুদ্ধে দু'জন, আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছুটতে পারল না লোকগুলো। খামারের লোকজন এসে পড়ায় পরাস্ত হতে বাধ্য হলো ওরা। ধরা পড়ল। খামারের শ্রমিকদের হাতে দু'চারটা চড়-থাপ্পড় খেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, হারুণ চৌহানই ওদেরকে খামারে অরুণের খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিল।

দুই অপরাধীকে সহ গোয়েন্দারা ফিরে এসে দেখে অরুণের কাছে পৌঁছে গেছে বাকি সবাই। মিসেস চৌহানকে দেখিয়ে কাজল বলল, 'অরুণ, তোমার মা।'

চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইল অরুণ। বিশ্বাস করতে পারছে না।

মিসেস চৌহান, 'অরুণ! অরুণ!' বলে চিৎকার করতে করতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে।

অরুণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। চুপ করে রইল সে। সত্যিই তার মা কিনা বিশ্বাস হচ্ছে না যেন তার। ভাবছে, চালাকি করে কাউকে পাঠিয়েছে হারুণ।

অনেক কথা বলে, বুঝিয়ে-টুঝিয়ে শেষে মিসেস চৌহান ওকে বিশ্বাস করাতে

পারলেন যে তিনিই ওর মা।

দুই অপরাধীর স্বীকারোক্তি আর অরুণের সাক্ষীতে হারুণ চৌহানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আরও নানা রকম চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেল হারুণ ও তার বাড়ির লোকজনকে জেরা করে।

ভীষণ কুটিল আর লোভী লোক হারুণ চৌহান। তার খামারে যতজন বার্মিজ আছে, সবাই অপরাধী। বার্মিজ পুলিশ খুঁজছে ওদের। হারুণের সহায়তায় সবাই অবৈধ পথে বাংলাদেশে ঢুকেছে। হারুণ ওদের আশ্রয় দিয়ে ওদের দুর্বলতার সুযোগে শুধু খাবার আর থাকার জায়গা দেয়ার বিনিময়ে যথেচ্ছ খাটিয়ে নিচ্ছে ওদের।

আরও শয়তানি করেছে হারুণ। আশেপাশের স্থানীয় গৃহস্থ আর ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 'কৃষক-শ্রমিক' সমিতি করার নামে প্রচুর টাকা হাতিয়েছে। তাদেরকে বুঝিয়েছে, অনেক বড় ব্যবসার অংশীদার করে নেয়া হবে ওদের। অনেক লাভ। হারুণের এ সব কাজ করার জন্যে দালাল আছে। সবগুলো সন্ত্রাসী। আবদুল ওহাবের কাছে এ রকম দু'জন দালালই গিয়েছিল। তাকে সমিতির সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দিতে। বাজারের দোকানদার মিরণ পোদ্দারের কাছেও এই প্রস্তাব নিয়েই দালালরা গিয়েছিল। ওদের উদ্দেশ্য ভাল না বুঝতে পেরে, প্রস্তাবে রাজি হয়নি মিরণ। ওহাব আর মিরণ দু'জনে মুখ খোলেনি সন্ত্রাসীদের ভয়েতেই, ওদের পরিচয় দিতে রাজি হয়নি।

সব রহস্যেরই সমাধান মিলল। চুরি করা ছবিটাও পাওয়া গেল হারুণের বাড়িতে। তার নিজের ড্রয়ারে। লোক পাঠিয়ে সে-ই চুরি করিয়েছিল। প্রমাণ হিসেবে সেটা জব্দ করল পুলিশ।

শেষ যে রহস্যটা খুঁতখুঁত করছিল কিশোর আর কাজলের মনে–অদ্ভুত সেই পাখি–তার জবাবও পাওয়া গেল। যান্ত্রিক পাখি ওগুলো। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানুষ প্রহরী রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি হারুণ চৌহান। তাই ওই পাখির ব্যবস্থা করেছিল। হংকঙের এক খেলনা কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছিল ওগুলো। তার বিনা অনুমতিতে কেউ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলেই রিমোট টিপে ওই পাখি লেলিয়ে দিত। যতক্ষণ আবার রিমোট টিপে পাখিগুলোকে থামানো না হয়, ততক্ষণ একনাগাড়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করেই যায় ওই যান্ত্রিক পাখি।

'বাপরে! জিনিস বটে একখান ওই হারুণ চৌহান!' মন্তব্য না করে পারল না মুসা। 'চিরকাল শুনে এসেছি, মানুষ কুকুর পোষে চোর তাড়ানোর জন্যে। কিন্তু গোয়েন্দা ভাড়ানোর জন্যে যে কেউ যান্ত্রিক পাখি পোষে জীবনে এই প্রথম শুনলাম!'

***

ইলেকট্রনিক আতঙ্ক

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

এক

'অ্যাকশন!' চিৎকার করে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা। ক্যামেরার লাল বোতামটা টিপে দিল সে।

গ্রীষ্মের এক দিন। সিনেমার শুটিঙের জন্যে চমৎকার সময়।

পুরানো আমলের পোশাক পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সহকারী গোয়েন্দা রবিন মিলফোর্ড ও আট বছরের ডন। ডন কিশোরের মেরিচাচীর বোনের ছেলে। ডনের বাবা মস্ত বিজ্ঞানী। নাম আইব্রাম হেনরি স্টোকার। অ্যারিজোনায় থাকেন।

রকি বীচ ও তিন গোয়েন্দার সঙ্গ ডনের খুবই পছন্দ। তাই ছুটিছাটাতে সুযোগ পেলেই বেড়াতে চলে আসে। এবারও এসেছে।

রবিন আর ডনের দিকে ভারিক্কি চালে এগিয়ে এল মুসা আমান। পরনে পুরানো আমলের কাউবয় পোশাক। গলায় বাঁধা লাল রুমাল। দুই হাতে দুটো সিক্স-শূটার গান। চেহারা আসল পিস্তলের মত হলেও ওগুলো আসলে খেলনা পিস্তল।

পুরানো আমলের ওয়েস্টার্ন ডাকাতদের অনুকরণে কণ্ঠস্বর খসখসে করে বলল, 'খবরদার!'

চিৎকার করে উঠল রবিন। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল ডন।

'তারমানে প্রাণটা খুব জরুরি। গুড। দাও, দামি দামি জিনিসপত্র যা যা আছে সব দিয়ে দাও,' কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল মুসা। হাত খালি করার জন্যে ওয়েস্টার্ন আউটলদের মত পিস্তল ঘুরিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাতে গেল, যাতে রবিন আর ডনের বের করে দেয়া মালামালগুলো নিয়ে পকেটে ভরতে পারে। কিন্তু 'আউটল'র ভাগ্য খারাপ; পিস্তলটা হোলস্টারে ঢোকানোর জন্যে চাপ দিতেই তার কোমরে বাঁধা হোলস্টারের বেল্ট খসে হাঁটুর কাছে চলে গেল। এ সময় পা বাড়াতে যাচ্ছিল সে। বেল্টে বেধে গিয়ে টান লেগে উপুড় হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। গড়িয়ে চিত হয়ে হাসতে লাগল বোকার মত।

'কাট! কাট!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। ভিডিও ক্যামেরার বোতাম টিপে টেপ চলা থামিয়ে দিল। বেশ কিছু ছেলেমেয়ে শুটিং দেখছিল। হাসাহাসি শুরু

করল ওরা।

'আহ্, কি দারুণ আউটল!' হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে মুসাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রবিন। 'পুরানো দিনে ওয়েস্টার্ন অঞ্চলে জন্মালে আর এই কাণ্ড করলে তোমার নাম মুসা আমান বদলে গিয়ে ভাঁড় আমান হয়ে যেত।'

ক্যাসেটের ফিতে আবার শুরুতে নিয়ে আসার জন্যে বোতাম টিপল কিশোর।

হাত দিয়ে শার্ট আর হাঁটুতে লাগা ধুলো ঝাড়তে লাগল মুসা। হাসিটা মোছেনি এখনও।

তিন ঘণ্টা ধরে কসরত করছে ওরা। কিন্তু এতক্ষণে একটা দৃশ্যেরও সফল চিত্র টেপে ধারণ করতে পারেনি। অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান ও পরিচালকের অদক্ষতা, দুর্বলতা আর অনভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি সমস্যা যেটা করছে, তা হলো ক্যামেরা। পুরানো মডেল। প্রচুর ব্যবহার করা জিনিস। আই-পিস, অর্থাৎ চোখ রাখার জায়গাটা ভাঙা। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভিসিআরে লাগানোর আগে কিছুই বোঝা যাবে না কি ছবি উঠেছে। ক্যামেরাটা আদৌ কাজ করছে কিনা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত নয় কিশোর।

বেল্টটা তুলে নিয়ে শক্ত করে পরল আবার মুসা। হাসি ঠেকাতে কষ্ট হচ্ছে রবিনের। মুসার দিকে তাকালেই হাসি এসে যাচ্ছে তার। মাথার ক্যাপটা কপালের পেছনে ঠেলে দিল ডন। সিনেমায় দেখা ওস্তাদ ওয়েস্টার্নদের আচরণ নকল করতে চাইছে। কিন্তু বয়েস এতই কম, হাস্যকর লাগছে তার এই বয়স্ক মানুষের মত ভাবভঙ্গি। শেষবারের মত আরেকবার চেষ্টা করে দেখার জন্যে তৈরি হলো শুটিং পার্টি।

'রেডি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। পেছনে ফিরে তাকাল। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে খুদে দর্শকরা। মুখ টিপে হাসছে এখনও অনেকেই। মনে মনে দমে গেল কিশোর। প্রতিবারেই শুটিং করতে গিয়ে কোন না কোন অঘটন ঘটছে। দর্শকদের হাসির পাত্র হতে হচ্ছে। এবার যাতে আর কোনো রকম ভুল না করে কেউ, সতর্ক করে দিল সে। ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হলো।

'রেডি! কোয়ায়েট! অ্যাকশন!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

দুই

ক্যামেরা থেকে ক্যাসেট বের করে ভিসিআরে ঢোকাল কিশোর।

তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার। টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই। ডেস্কের ওপাশে বসা গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা। দুই পাশে টুলে বসা বাকি

তিনজন–মুসা, রবিন আর ডন। সবার নজর টেলিভিশনের দিকে।

ডেস্কের ওপর দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর। ভিসিআর চালু করার আগে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। গম্ভীর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমি তিন গোয়েন্দা ফিল্ম কোম্পানির পরিচালক কিশোর পাশা, আমাদের প্রথম ওয়েস্টার্ন ছবি "লাল পাহাড়ের ডাকাত" ছবির প্রথম দৃশ্য দেখার জন্যে গর্বের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের।'

নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল রবিন। নড়েচড়ে বসল মুসা। কিশোরের অতি নাটকীয়তায় হেসে ফেলল ডন।

কিন্তু ভিসিআরের প্লে-বাটন টিপে দিতেই হাসি মুছে গেল তার। এক মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে গেল টেলিভিশনের পর্দা। পরক্ষণে সোনালি চুলওয়ালা এক মহিলাকে হেঁটে যেতে দেখা গেল একটা মার্কেটের দিকে।

'ওই মহিলা আবার কে?' ডন বলল।

মহিলার সঙ্গে দুটো ছেলেমেয়েও আছে। বয়েস বলছে হাই স্কুলে পড়ে। একটা কাপড়ের দোকানের পাশ কাটাল ওরা। একটা বইয়ের দোকানের সামনে থামল। দোকান থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন একজন ভদ্রলোক। চোখে চশমা। হাতে বইয়ের ব্যাগ।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। এ ছবি ওদের ক্যাসেটে ঢুকল কি করে?

ইজেক্ট বাটন টিপে দিল সে। টেপটা বের করে লেবেল দেখল ভালমত। সবই ঠিক আছে। আবার ভিসিআরে ঢুকিয়ে প্লে বাটন টিপল।

কিন্তু সেই একই ছবি। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে দোকানের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন মহিলা।

'ঘটনাটা কি?' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। 'এ রকম তো হওয়ার কথা না।'

'কারা এরা?' ডনের প্রশ্ন।

'জানি না। জীবনে এই প্রথম দেখলাম।'

'আমাদের সিনেমায় ঢুকল কিভাবে?'

'বুঝতে পারছি না। ক্যাসেটটা আমাদের, কিন্তু ছবি তো আমাদের না।'

ফাস্ট ফরোয়ার্ড বাটন টিপে ক্যাসেটের ফিতে সামান্য সরিয়ে দিল কিশোর। তারপর আবার প্লে টিপল। উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই মার্কেটেই দেখা গেল পরিবারটাকে। একটা কম্পিউটারের দোকান থেকে বেরোচ্ছেন সেই ভদ্রলোক। হাতে একগাদা কম্পিউটার ম্যাগাজিন।

'কোত্থেকে এনেছ এ টেপ?' মুসা জানতে চাইল।

'যেখান থেকেই আনি, আনকোরা নতুন,' জবাব দিল কিশোর। 'সুপারমার্কেট থেকে কিনেছি আজ সকালে। গোলমালটা কোথায় সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

থাপ্পড় মারল, যেন সব দোষ ওটার।

'ওটাকে মারছ কেন? ছবি উল্টাপাল্টা হয়ে গেলে চড় মেরে ঠিক করার নিয়ম আছে নাকি?'

'তুমি চুপ করো!' আবার ভিসিআরটাকে থাপ্পড় মারল কিশোর।

'অকারণে রাগ করছ,' রবিন বলল। 'আমার মনে হয় ক্যাসেট খারাপ। কিংবা আগের ছবি ছিল ওতে। যদিও নতুন ক্যাসেটে এ রকম কখনই দেখা যায় না। যে দোকান থেকে কিনেছ, গিয়ে বলো ওদের। বদলে নিয়ে এসো। কাল নাহয় আবার শুটিং করব আমরা।'

'ও ঠিকই বলেছে,' মুসা বলল। 'অত তাড়াহুড়া তো নেই। হাতে প্রচুর সময়। পুরো গরমকালটাই সামনে পড়ে আছে।'

বাড়ি চলে গেল রবিন আর মুসা। সাইকেল নিয়ে সুপারমার্কেটে রওনা হলো কিশোর। ক্যাসেটটা যে দোকান থেকে কিনেছে, তার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল।

'ক্যাসেটটা তো নতুন না, ছবি আছে,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া আমাদের ছবি তোলার সময় আগের ছবি মুছে গিয়ে আমাদেরটাই ওঠার কথা। মুছলও না, উঠলও না। কি বলবেন এটাকে?'

'বুঝতে পারছি না! এ রকম ঘটনা তো ঘটে না,' ম্যানেজার বলল।

ক্যাসেট বদলে দিল ম্যানেজার।

বাড়ি ফিরে প্রথমেই ক্যাসেটটা পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। ভিসিআরে ঢুকিয়ে প্লে বাটন টিপল। জোরাল হিসহিস শব্দ করতে লাগল টেলিভিশনের স্পীকার, পর্দায় শুধু ঝিরিঝিরি, কোনো ছবি নেই। আপনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এমনই তো হবার কথা।'

সন্তুষ্ট হয়ে ভিসিআর থেকে ক্যাসেটটা বের করে ক্যামেরায় ঢুকিয়ে রাখল। আগামী দিনের জন্যে।

পরদিন আকাশ সকাল থেকেই মেঘলা। বাইরে শুটিং করা যাবে না বটে, তবে ঘরের ভেতরের দৃশ্যগুলো করে ফেলা যায়। সেট সাজানো শুরু করল চারজনে মিলে। কিশোরদের বাড়ির রান্নাঘরটাকে বেছে নেয়া হলো এ কাজের জন্যে। দেয়ালে দেয়ালে কাগজ সাঁটিয়ে, ছবি ঝুলিয়ে পুরানো আমলের ওয়েস্টার্ন স্যালুনের রূপ দিল। দৃশ্যটা হবে তাস খেলার। রবিন আর মুসা টেবিলে বসে খেলবে। ওদের সামনে থাকবে টাকার স্তূপ। মুখোমুখি বসল ওরা। নকল টাকা সাজিয়ে রাখা হলো দু'জনের মাঝখানের টেবিলে।

কিশোর পরিচালক। ক্যামেরাম্যানও সে-ই। কী কী করতে হবে বুঝিয়ে দিল দুই অভিনেতাকে। সহকারী হিসেবে ডনকে রাখল। ক্যামেরাটা যাতে গোলমাল না

করে, এ ব্যাপারে সতর্ক রইল কিশোর। সব ঠিকঠাক আছে কিনা ভালমত পরীক্ষা করে দেখল। ক্যামেরাটা পুরানো। ওর চাচা রাশেদ পাশা কিনে এনেছেন। স্যালভিজ ইয়ার্ডের ব্যবসা আছে ওদের। পুরানো মাল কিনে এনে ফেলে রাখা হয়। ওগুলোরও ক্রেতা আছে। কয়েক দিন আগে একটা ইলেকট্রনিকের দোকান থেকে কিছু পুরানো মাল কিনেছেন রাশেদ পাশা। বিরাট এক বাক্সে ভরে নিয়ে ফিরেছেন। তার মধ্যেই ক্যামেরাটা পেয়েছে কিশোর। চাচার কাছে চাইতেই দিয়ে দিয়েছেন। আই-পিসটা ভাঙা, বিক্রি হবার সম্ভাবনা কম, নইলে হয়তো দিতেন না। কিশোরও চাইত না।

তিন

যাই হোক, সেদিন খুব সতর্ক ভাবে শুটিঙের কাজ শেষ করল ওরা। গত ক'দিন ধরে প্র্যাকটিস করছে। অভিনেতারাও ক্রমেই পাকা হয়ে উঠছে। ভুলভাল তেমন হলো না। তা ছাড়া, বাইরে শুটিং করছে না বলে দর্শকদেরও ঝামেলা নেই। সঙ্গে যেতে পারছে না ছেলেমেয়ের দল। ওদের হাসাহাসি, হট্টগোল আর ইয়ার্কির যন্ত্রণায় কাজ করা মুশকিল হয়ে যায়।

চাচা-চাচী বেড়াতে গেছেন। মেরিচাচীর বোনের বাড়িতে। ফিরতে দেরি হবে, সে-কারণেই রান্নাঘরটা ব্যবহার করতে পারছে ওরা। চাচী ফেরার আগেই কাজ শেষ করে সব কিছু ঠিকঠাক করে রাখবে। দুপুরে লাঞ্চের সময়টাতেও খেতে না বসে কাজ করল ওরা। মুসা ঘ্যানর-ঘ্যানর করতেই থাকল, কিন্তু কানে তুলল না কিশোর। শুটিং শেষ করে তারপর খাওয়া।

ঠিকঠাক মতই শেষ হলো সব। স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিয়ে বসার ঘরে চলে এল ওরা। খেতে খেতে ছবি দেখবে।

ক্যামেরা থেকে ক্যাসেটটা বের করে ভিসিআরে ঢুকিয়ে দিল কিশোর। রিওয়াইন্ড করে শুরুতে নিয়ে এসে প্লে বাটন টিপল।

হাতে খাবার, চোখ টেলিভিশনের দিকে। ভাল মেজাজে আছে সব ক'জনই।

কিন্তু পর্দায় ছবি ফুটতেই মুসাও চিবানো ভুলে গেল। পড়ার টেবিলে বসে বই পড়ছে একটা মেয়ে।

'আরে এ তো সেই মেয়েটাই!' চিৎকার করে উঠল ডন। 'ওকেই কাল পরিবারের সঙ্গে দেখেছিলাম না? মার্কেটে?'

'ভূতের কাণ্ড!' ভয়ে ভয়ে ঘরের চারপাশে তাকাল মুসা। 'ওদেরও বোধহয় স্কুল ছুটি। আর কোনো কাজ না পেয়ে আমাদের পেছনে লেগেছে ভূতগুলো।

আমাদের ছবি মুছে দিয়ে নিজেদের ছবি ভরে দিচ্ছে।'

'মজা করার জন্যে?' ডনের প্রশ্ন।

'এই, চুপ, চুপ!' থামিয়ে দিল কিশোর। 'ফালতু কথা বন্ধ।' গভীর মনোযোগে ছবির দিকে তাকিয়ে আছে সে।

সবার চোখ টেলিভিশনের পর্দার দিকে। কিছুই ঘটছে না। কোনো পরিবর্তন নেই ছবিতে। অনেকক্ষণ পর নড়ল মেয়েটা। বইয়ের একটা পাতা ওল্টাল।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কিছু বুঝছ?'

'না,' গম্ভীর ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের টেপে ঢুকল কিভাবে সেটাই তো মাথায় ঢুকছে না।'

লম্বা চুলে আঙুল চালাল ছবির মেয়েটা। কানের গোড়া চুলকাল। বইয়ের পাতা ওল্টাল আবার।

'মনে হচ্ছে আরেকটা নষ্ট টেপ নিয়ে এসেছ,' রবিন বলল।

'উঁহু! এবার আর নষ্ট বলা যাবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ক্যাসেটটা আনার পর ভালমত পরীক্ষা করে নিয়েছিলাম কাল রাতেই। ব্ল্যাঙ্ক টেপ ছিল। ঝিরিঝিরি ছাড়া কোনো ছবি ছিল না।'

'অন্য কোনো চ্যানেলে নেই তো?' মুসার প্রশ্ন। 'হয়তো টিভি শো চলছে। দেখো না ভাল করে।'

'দেখছিই তো। ভিসিআর যে চ্যানেলে চলে সেই চ্যানেলেই আছে। আর টিভি শো-তে কি সারাক্ষণ বসে বসে পড়তে থাকে নাকি একটা মেয়ে?'

'পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো?'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'চারজন একসঙ্গে?'

'তাহলে ভূত ছাড়া আর কিছু না!' নিজের রায় ঘোষণা করে দিল মুসা।

'রান্নাঘরটা আমাদের রান্নাঘরের মতই মনে হচ্ছে,' ডন বলল। 'কিন্তু জিনিসপত্র সব অন্য রকম। কোনো কিছুই মেলে না। মুসা ভাই, অদৃশ্য ভূতের যে যুক্তি তুমি দেখাচ্ছ, সেটাও তো মিলানো যাচ্ছে না। ভূত হলে বড়জোর চরিত্রগুলো বদলাত, জিনিসপত্র আর সেট একই রকম থাকত।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। বার দুই চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। ছবির ঘরটার মেঝের দিকে তার চোখ। দুই ঘরের মেঝে দুই রকম। নকশা মেলে, কিন্তু রঙ মেলে না।

সেটা শুনে রবিন বলল, 'শহরের অনেক বাড়ির মেঝের নকশাই ওরকম। আমাদের রান্নাঘরেরও এ রকম নকশা। রঙ তো মিলছে না। এ থেকে কিছু বোঝা যাবে না।'

ফাস্ট ফরোয়ার্ড বোতামটা কয়েক মিনিট টিপে ধরে রাখল কিশোর। তারপর

আবার প্লে-তে দিল।

পুরো পরিবারটাকে দেখা গেল এখন। মেয়েটা যে টেবিলে বসে পড়ছিল সেটা ঘিরে বসেছে চারজন–বাবা, মা, ছেলে ও মেয়ে। শেষ বিকেল। জানালা দিয়ে তেরছা ভাবে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। আগের দিন মার্কেটে এদেরকেই দেখা গিয়েছিল। টেবিলে রাখা একটা জন্মদিনের কেক। ষোলোটা মোমবাতি জ্বলছে ওটাকে ঘিরে। ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিভিয়ে দিল ছেলেটা।

বাকি সবাই হাততালি দিয়ে ওকে 'হ্যাপি বার্থডে' জানাল। চেঁচামেচি। হাসাহাসি।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোররা। চারজনেরই চোখেমুখে বিস্ময়।

পর্দার ছবি এখন সারা ঘরে ঘুরতে শুরু করল, ক্যামেরার চোখটা যেন জানে না কোনদিকে ফোকাস করবে। রিফ্রিজারেটরটা দেখা যাচ্ছে। তারপর ক্যামেরার চোখ সরে গেল সিংকের দিকে, সেখান থেকে মাইক্রোআভনটা পার হলো। ফোন বাজল। টেলিভিশনের মধ্যে। ক্যামেরার চোখের সামনে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল কেউ। শোনা গেল একটা পুরুষকণ্ঠ, 'হাল্লো!' আবার দেখা গেল ছবি। ছেলেটার ওপর স্থির হলো ক্যামেরার চোখ। একটা জন্মদিনের উপহার খুলছে সে। তার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে। কানে টেলিফোনের রিসিভার। 'হালো! হালো! কথা বলছেন না কেন?' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'আবার হুমকি দিল নাকি কেউ?' মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

হাত নেড়ে যেন মাছি তাড়ালেন ভদ্রলোক। 'কোনো দুষ্টু ছেলের শয়তানি। বসে থেকে থেকে ভাল লাগছে না, মজা করছে।'

হঠাৎ করেই ছবি চলে গেল পর্দা থেকে। হিসিয়ে উঠল টেলিভিশনের স্পীকার। চমকে দিল গোয়েন্দাদের। রুদ্ধশ্বাসে ছবি দেখছিল ওরা। পর্দায় এখন শুধুই ঝিরিঝিরি।

বোতাম টিপে থামিয়ে দেয়ার জন্যে স্টপ বাটনের দিকে হাত বাড়াল রবিন।

'দেখি রাখো রাখো!' বাধা দিল কিশোর। 'আবার ফিরে যাও। অদ্ভুত কি যেন দেখলাম মনে হলো। আমার কল্পনাও হতে পারে।'

'অদ্ভুত আর কি দেখবে?' মুসা বলল। 'পুরো ব্যাপারটাই তো অদ্ভুত! আচ্ছা, ভিসিআরের ভূত না তো? টেলিভিশনের ভূতওয়ালা সিনেমা দেখেছি। এটা মনে হচ্ছে ভিসিআরের ভূত! কিংবা ক্যামেরার। কোত্থেকে কিনেছিলে?'

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। রবিনের দিকে হাত বাড়াল, 'দেখি, রিমোটটা দাও তো। তোমরাও দেখো। কিছু চোখে পড়লে বলবে।'

প্লে-তে দিয়ে রেখে রিওয়াইন্ড বাটন টিপে ধরে রাখল সে। পেছনে সরে আসতে লাগল টেপ। দ্রুত পিছিয়ে আসছে ছবি। কিছুটা পিছানোর পর বোতাম ছেড়ে দিল কিশোর। দু'তিন বার ঝাঁকি খেয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল ছবি। মসৃণ

গতিতে চলতে লাগল আবার।

অচেনা পরিবারটাকে দেখা গেল। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত।

ছবি আরও খানিকটা পিছাতে হবে। প্লে-তে রেখে আবার ফাস্ট রিওয়াইন্ড করল কিশোর। কিছুটা পিছিয়ে এসে ছেড়ে দিল।

আবার স্বাভাবিক ছবি। রান্নাঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যামেরার চোখ। রিফ্রিজারেটরের ওপর দেখা যাচ্ছে একটা নোটবই। পেছনের দেয়ালে ছবি ঝোলানো। সিংকের দিকে সরে গেল ক্যামেরা। জানালার চৌকাঠের নিচের অংশে সাজানো ছোট ছোট ফুলের টব। সেখান থেকে মাইক্রোওয়েভ আভেন হয়ে টেবিলে ফিরে এল ছবি।

'ওই যে! ওই যে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'দেখতে পাচ্ছ?'

'কি দেখব?' নির্বিকার ভঙ্গিতে মুসা জবাব দিল। 'আরেকজনের রান্নাঘর। দেখার কি আছে?'

'মাইক্রোওয়েভের ওপর স্টিল করে দাও তো!' রবিনও দেখতে পেয়েছে।

এখনও দেখেনি মুসা। 'ও তো সাধারণ...।'

মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই স্টিল বাটন টিপে দিয়েছে কিশোর। কিন্তু সরে গেছে ছবি। জায়গামত পড়েনি।

প্লে-তে রেখেই আবার ফাস্ট ব্যাকওয়ার্ড দিয়ে মাইক্রোওয়েভটার ওপর নিয়ে এল সে। আরও পেছনে সরিয়ে বোতাম ছেড়ে দিল। টিপে দিল স্টিল বাটন। দু'তিনটে ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল ছবি।

'আরে, ওকথা লিখেছে কেন?' ডনের চোখেও পড়েছে।

টেলিভিশনের পর্দায় স্থির হয়ে আছে চার জোড়া চোখ। মুসার মুখেও কথা নেই। সে-ও দেখতে পাচ্ছে। মাইক্রোওয়েভের ডিসপ্লেতে যেখানে ঘড়ি থাকে, সেখানে ইংরেজিতে লেখা চার অক্ষরের একটি শব্দ: 'কিল'!

'খাইছে!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'কে কাকে খুন করতে চায়?'

চার

হ্যারিসন ইলেকট্রনিক্স-এর মালিক ও টেকনিশিয়ান 'হ্যারি আঙ্কেল' কিশোরকে বলে দিল বিকেল চারটেয় দেখা করতে। ক্যামেরাটায় কি সমস্যা হয়েছে, কেন ছবি ওঠে না, দেখানোর জন্যে তার কাছে জিনিসটা নিয়ে এসেছিল কিশোর।

বিকেল চারটে বাজার পনেরো মিনিট আগে সাইকেল নিয়ে বেরোল কিশোর ও ডন। আগেভাগেই বেরিয়েছে। ক্যামেরাটায় কি হয়েছে, জানার জন্যে অস্থির

হয়ে আছে ওরা। বাইরে সাইকেল রেখে দোকানে ঢুকল দু'জনে। বেজে উঠল দরজায় লাগানো ঘণ্টা। গভীর মনোযোগে কাজ করছিল লম্বা একটা টেবিলের ওপাশে বসা ছোটখাট একজন মানুষ। চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পা লেগে চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেল। ভদ্রলোকের চমকানো দেখে কিশোরের মনে হলো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে তার।

'এমন করে ঢোকে নাকি কেউ!' বুক চেপে ধরে বলল সে। চেয়ারটা তুলে সোজা করে বসাল।

'সরি,' কিশোর বলল। 'আপনাকে এ ভাবে চমকে দিতে চাইনি।...এত অস্থির হয়ে আছি...তাড়াহুড়া...বুঝতেই পারছেন...আমাদের ছবিটা শেষ করে ফেলা দরকার।'

দোকানটা ছোট। আলো কম। বাতাসে সীসা আর রজন পোড়া গন্ধ। লম্বা টেবিলে ছড়ানো নানা রকম যন্ত্রপাতি, সুইচ, স্ক্রু-ড্রাইভার, ইলেকট্রনিক পার্টস। ধীরে ধীরে আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ল লোকটা। গায়ে লাল চেক শার্ট। মাথায় একটা সাদা ক্যাপ। তাতে কালি লাগা আঙুলের ছাপ।

'উঁহু!' মাথা নেড়ে হ্যারি বলল, 'ঠিক করতে পারলাম না।'

'সমস্যাটা কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'এ ধরনের ক্যামেরার ভেতরে একটা খুদে কম্পিউটার বসানো থাকে। অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে এই যন্ত্রটা। ক্যামেরার ভেতরে কতখানি আলো ঢুকবে সেটার পরিমাপ থেকে শুরু করে ছবির দূরত্ব মাপা, ছবি তোলা, সব কিছু কন্ট্রোল করে এই মিনি কম্পিউটার।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। এ সব তথ্য জানা আছে তার। ডনের দিকে ফিরল সে। চুপ করে আছে ডন। সে জানে না। তথ্যটা তার কাছে নতুন।

'তোমাদের এই ক্যামেরাটাতেও কম্পিউটার আছে,' হ্যারি বলল। 'তবে ভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং করা রয়েছে এটাতে। ফিক্সড প্রোগ্রাম। সুইচ অফ করে দিতে পারলে প্রোগ্রাম বাতিল করা যায়। কিন্তু সুইচটা খুঁজে পাইনি। বদলাতে পারলাম না। আই-পিসটাও কাজ করে না সেজন্যে।'

'কিন্তু অন্য লোকের ছবি ওঠে কি করে তাহলে?'

'আমার মনে হয় কম্পিউটারটাতে ওসব ছবি স্টোর করা আছে। ক্যামেরাটা আগে যার কাছে ছিল, তার তোলা। তোমরা এখন কিছু তুলতে গেলেই ক্যাসেটে সেসব উঠে যাচ্ছে।'

'কোনওভাবে সেটা বন্ধ করা যায় না?'

'হয়তো যায়, আগে যার কাছে ছিল বন্ধ করার উপায়টা সে হয়তো জানে। কম্পিউটারের প্রোগ্রামিংও হয়তো বাতিল করতে পারে। কিন্তু আমি পারলাম না।' জোরে জোরে কপাল ডলল হ্যারি। 'সুইচই পেলাম না, বাতিল করব কি করে।

তাই স্টোর করা ছবি যদি থেকেও থাকে, সেগুলোও বদলানোর কোনো উপায় দেখছি না।'

'কিছুই কি করার নেই?'

'আমি পারলাম না। দেখো, বাড়ি নিয়ে গিয়ে, যত সুইচ আছে সব টেপাটিপি করে। কোনো একটা সুইচ হয়তো কাজ করেও বসতে পারে। সব ওলট-পালট করে দিতে পারে। কিংবা অফ করে দিতে পারে মিনি কম্পিউটারটাকে।'

*

রাতের বেলায় সেদিন হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। গড়িয়ে অন্যপাশে ফিরে ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত প্রায় ৩টা। পিপাসা লেগেছে খুব। ঘরে পানি রাখেনি। উঠে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। ঘুমানোর চেষ্টা করল আবার। পারল না। গলা শুকিয়ে গেছে। ঘুম আসছে না। পানি না খেলে আসবেও না। বিছানা থেকে নামতে বাধ্য হলো।

রান্নাঘরে ঘন অন্ধকার। আন্দাজে রিফ্রিজারেটরের কাছে এসে দাঁড়াল। পানির বোতল বের করল।

পানি খেয়ে বসার ঘরের ভেতর দিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। স্টেরিও সেটটার সুইচ অন করা। একটু আগেও সে রান্নাঘরে যাওয়ার সময় বন্ধ ছিল ওটা। ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল। কাউকে চোখে পড়ল না। এত রাতে কারও থাকার কথাও নয়। চাচা ওপরতলায় নাক ডাকাচ্ছেন, কোনো সন্দেহ নেই তার। চাচীও নিশ্চয় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এত রাতে ডনও নামবে না স্টেরিও বাজিয়ে গান শোনার জন্যে। তাহলে কে?

শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের ভেতরে।

সুইচ অফ করার জন্যে স্টেরিও সেটটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। খুব মৃদু শব্দে বাজনা বাজছে। রেডিওতে। আচমকা থেমে গেল বাজনা। খবর পড়া শুরু হলো। তারপর গান। ডায়ালের কাঁটাটার দিকে বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে সে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে সরে যাচ্ছে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে। স্টেশন টিউন করার নবটার দিকে তাকাল সে। খুব ধীরে আপনাআপনি ঘুরছে ওটা।

এতক্ষণে লক্ষ করল, ওদের আগের সেটটা নয়! অন্য সেট!

বুকের মধ্যে ধুড়ুস ধুড়ুস বাড়ি মারতে লাগল হৃৎপিণ্ড।

ওর চোখের সামনে অফ হয়ে গেল সুইচ!

আপনাআপনি!

কিশোরের মনে হতে লাগল, তার মাথা গরম হয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে নিজের ঘরে ঢুকল।

*

পরদিন সকালে রান্নাঘরে নেমে দেখে চাচা টেবিলে বসে কফি খেতে খেতে

খবরের কাগজ পড়ছেন। চাচী নেই। বোধহয় স্যালভিজ ইয়ার্ডের অফিসে। অফিসটা তিনিই চালান।

টেবিলে নাস্তা সাজানো আছে। চেয়ারে বসল কিশোর। পাঁউরুটির টুকরোতে মাখন লাগাতে শুরু করল। চাচাকে জিজ্ঞেস করল, 'নতুন স্টেরিওটা কবে কিনলে?'

'নতুন দেখলি কই? পুরানো।'

'জানি,' জবাব দিল কিশোর। 'নতুন বলে আসলে অন্য সেট বোঝাতে চেয়েছি। আমাদের আগের সেটটা না।'

কাগজটা নামিয়ে রাখলেন রাশেদ পাশা। ভাতিজার দিকে তাকালেন। 'কাল রাতে রেখেছি। কেন?'

জবাব দিল না কিশোর।

পাঁচ

'অকারণ খাটনি,' মুসা বলল। 'ওই নষ্ট ক্যামেরা দিয়ে পরের বাড়ির ছবি তোলার চেয়ে অন্য কিছু করা ভাল। ছুটিটা কি করে কাটাব, ভেবে বের করা দরকার।'

লাঞ্চের পর কিশোরদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে সে আর রবিন। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসেছে কিশোরের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে ডনও আছে।

ক্যামেরাটা খুলে বসেছে কিশোর। 'হ্যারি তো পারেনি, নিজেই দেখি না একবার চেষ্টা করে, মেরামত করতে পারি কিনা।'

'করলে করোগে,' হাত নাড়ল মুসা। 'আমি আর এর মধ্যে নেই। নষ্ট ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অকারণ চেঁচাতে পারব না।'

কিশোরের পক্ষ নিল রবিন, 'মেরামতের চেষ্টা করছে, করুক না, ঠিকও তো হয়ে যেতে পারে। যে কাজে হাত দিয়েছি সেটাই শেষ করতে চাই। ছুটি কাটানোর জন্যে অন্য কিছু আর করতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে নিয়ে টেবিলের কাঠে খোঁচানো শুরু করল মুসা। দু'তিনটে খোঁচা দিয়ে রেখে দিল। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঝলমলে রোদ। নীল আকাশ। 'আবারও বলছি, অকারণে সময় নষ্ট করছি। তারচেয়ে পাহাড়ের ওদিকটায় ঘুরে এলে পারি। এত সুন্দর বিকেল। চলো, বনের ভেতরে পাখি দেখিগে।'

ডনের মুখ দেখে মনে হলো দ্বিধায় পড়ে গেছে। কোনটা করবে ঠিক করতে পারছে না। অভিনয় এবং পাখি দেখা, দুটোই তার পছন্দ। তবে ক্যামেরাটা ভাল

হলে অভিনয় বাদ দিয়ে কোনোমতেই পাখি দেখতে যেত না। রবিনের কথাই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো তার কাছে।

'এত অস্থির হচ্ছ কেন?' মুসাকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'ঠিকও তো হয়ে যেতে পারে।'

রবিন আর ডনের দিকে তাকাল মুসা। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। 'ধরা যাক ঠিক হলো না, তখন?'

'তখনকারটা তখন ভাবা যাবে।'

খানিকক্ষণ ক্যামেরার পার্টসগুলোকে খোঁচাখুঁচি করে আবার স্ক্রু লাগিয়ে জোড়া লাগাল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'ডিরেক্টর বদল করব কিনা ভাবছি।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'আমার জায়গায় তুমি ডিরেক্টর হও।'

মুসা অবাক। 'তাতে লাভ?'

'লাভ-লোকসান জানি না। ক্যামেরাটাকে খোঁচালাম। সুইচগুলো টেপাটিপি করলাম। ঠিক হয়েও যেতে পারে। তবে আমি শিওর না।'

'কিন্তু এর সঙ্গে আমার ডিরেক্টর হবার সম্পর্ক কি?'

'ছবি তোলার সময় ক্যামেরার আই-পীসে সারাক্ষণ চোখ থাকে আমার। কোনো ভুলচুক হয়ে থাকলে দেখার উপায় নেই। তুমি ছবি তোলার সময় হয়তো কোনো কিছু চোখে পড়ে যেতে পারে আমার। ভুলটা কোথায় হচ্ছে, বুঝে যেতে পারি।'

'হুঁ! চলো।'

*

বাইরে গেল না ওরা। খুদে দর্শকদের ভয়ে। ইয়ার্ডের ভেতরেই পুরো একটি ঘণ্টা গলদঘর্ম হলো।

শেষ হলো শুটিং। ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ডন। রবিন বসে কপালের ঘাম মুছল। কিশোর গিয়ে বাগানের হোস পাইপ থেকে পানি খেয়ে এল।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে দরাজ হাসি হাসল মুসা। 'কেমন বুঝলে?'

'সিনেমা তোমার রক্তে,' কিশোর বলল। 'মনে হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে সিনেমায় ঢুকলেই ভাল করবে।'

মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান সিনেমার লোক। স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টর।

কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি উঠেছে দেখার জন্যে তর সইছে না কারোরই।

মুসা বলল, 'চলো, কি উঠেছে দেখতে দেখতে জিরানো যাবে।...ক্যামেরার

সামনে কেমন বোকা বোকা লাগছিল তোমাদের। অভিনয় করতে গেলে সবাইকেই অমন লাগে নাকি?'

'জানি না। হয়তো নতুনরা এমনই করে। চলো, ছবি দেখা যাক। আশা করি, এবার ঠিকমতই উঠেছে।'

ক্যামেরা কাঁধে আগে আগে চলল মুসা। ঘরে ঢুকল সবার আগে। বাইরের রোদ থেকে এসে ঘরের ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার লাগল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল মুসা। সোফায় বসল কিশোর, রবিন ও ডন।

ক্যামেরা থেকে ক্যাসেট বের করে ভিসিআরে ঢোকাল মুসা।

সবার চোখ টেলিভিশনের পর্দার দিকে।

প্রথমে কয়েক সেকেন্ড ঝিরিঝিরি। তারপর ছবি ফুটল পর্দায়। একটা বাড়ি দেখা গেল।

'এই তো, আজ তো ঠিকই উঠল!' তুড়ি বাজিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা: 'একেই বলে ওস্তাদের কাজ! আরও আগেই ক্যামেরাটা আমার হাতে তুলে দেয়া উচিত ছিল!'

হাসি ফুটল ডন আর রবিনের মুখেও। যাক, কষ্ট সার্থক হয়েছে। কিন্তু কিশোর হাসছে না। 'কই, আমাদের বাড়িটা না তো!'

মুহূর্তে গুঞ্জন থেমে গেল। হাসাহাসি বাদ দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেলিভিশনের দিকে তাকাল মুসা, ডন ও রবিন।

ছবির বাড়িটা দেখতে অনেকটা কিশোরদের বাড়িটার মতই। কিন্তু ডান পাশের টিনের ছাউনিটা নেই। বারান্দার সিঁড়ির দুই পাশের দেয়ালের রঙও আলাদা। সামনের উঠানে এত বেশি ঘাস আর অযত্নে এত বড় হয়ে গেছে, বহুকাল আগেই ছেঁটে ফেলা উচিত ছিল।

'বুঝলাম না!' হতাশ ভঙ্গিতে এলিয়ে পড়ল মুসা। 'কার বাড়ির ছবি তুললাম?'

'না বোঝার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'সেই বাড়িটা। যে বাড়ির রান্নাঘরের ছবি উঠে গিয়েছিল।'

'ধূর! খামাখা কষ্ট, বললাম না? পাখি দেখতে গেলেই ভাল করতাম।'

*

হাল ছাড়ল না ওরা। বসার ঘরে শুটিং করল এবার। কিন্তু ভিসিআরে ক্যাসেট চালিয়ে সেই এক ছবি।

অন্য বাড়িটার বসার ঘর দেখা যাচ্ছে। সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যামেরার চোখ। এমনকি ছাতও বাদ যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেন অটো-ফোকাস অফ করে দিচ্ছে কেউ।

বাড়ির কর্তা বসে বই পড়ছেন। ক্যামেরার চোখ বইটার ওপর এমন ভাবে

ফোকাস করল, নামটাও পড়া গেল।

'অ্যাডভান্সড আরটারিয়াল ইনটেলিজেন্স,' জোরে জোরে পড়ল ডন।

'আরটারিয়ান না, আরটিফিশিয়াল,' শুধরে দিল কিশোর। 'আরটিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স।'

'মানে কি?' বুঝতে পারল না মুসা।

'এমন ধরনের কম্পিউটার তৈরির চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা,' রবিন জানে বিষয়টা, 'যেগুলো নিজে নিজে ভাবতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে–মানুষের মত।'

কার্পেট পরিষ্কার করছে ছবির ছেলেমেয়ে দুটো। সমানে ঘুরে চলেছে ক্যামেরার চোখ। জানালা, দেয়াল, মেঝে, বাদ দিচ্ছে না কোনো কিছুই। মহিলাকেও দেখা গেল। দেয়ালের একপাশে টেবিলে বসে লিখছেন।

খোলা দরজার দিকে সরে গেল ক্যামেরার চোখ। একটা মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল। অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়ল গোয়েন্দাদের। এক বাহুর একটা ডেস্ক ল্যাম্প। আপনাআপনি নড়ছে ওটা। যেন অদৃশ্য থেকে কেউ ওটাকে নড়াচ্ছে, জায়গামত আলো ফেলার ব্যাবস্থা করছে।

'খাইছে!' ভয় পেয়ে গেল মুসা। 'ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি?'

জবাব দিল না কিশোর। সে নিজেই বুঝতে পারছে না জিনিসটা কি।

'রোবট না তো!' রবিন বলল।

'উঁ?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

'রোবট, রোবট,' আবার বলল রবিন। 'কেন, দেখনি, ফ্যাক্টরিতে গাড়ি বানানোর কাজে যেগুলো ব্যবহার করে? বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্যে প্রোগ্রামিং করা থাকে ওগুলোয়। রঙ করা থেকে ঝালাই করা, প্রায় সবই করতে পারে ওসব মেশিন। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত কাজ করতে পারে, অনেক বেশি নিখুঁতভাবে।'

'কিন্তু ছবির ওটা তো ফ্যাক্টরি না,' মুসা বলল। 'ওটা বাড়ি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' জবাব দিল রবিন। 'কেবল বুঝতে পারছি না, এই ধরনের রোবট ওরা বাড়িতে রেখেছে কেন?'

'উনি হয়তো বিজ্ঞানী,' টেলিভিশনের দিকে আঙুল তুলে বই পড়ায় মগ্ন ভদ্রলোককে দেখাল ডন। 'উনিই বানিয়েছেন। দেখছ না, বসে বসে কম্পিউটার আর আরটিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের ওপর লেখা বই পড়ছেন।'

'তোমার ক্যামেরাটার বারোটা বাজিয়েছেন তাহলে উনিই,' কিশোরকে বলল মুসা।

আবার যখন ক্যামেরার চোখ ঘুরল, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখা গেল না। আগের জায়গায় নেই। হয়তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে ওদের টেলিভিশনটার ওপর গিয়ে পড়ল ক্যামেরার চোখ। সরে গেল একটা সাইড

টেবিলের ওপর যেখানে একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে একটা ল্যাম্পের পাশে।

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো?' ফিসফিস করে বলল মুসা, 'ও বাড়ির ক্যামেরাটা যে চালাচ্ছে, সে পাগল। কিংবা ভূত!'

'ভূতে ক্যামেরা চালায় না!' কিশোর বলল। 'আমি ভাবছি, কে লোকটা? সারাক্ষণ ক্যামেরা চালানো ছাড়া আর কি কোনো কাজ নেই তার? আরও একটা কথা, লোকটা ওই পরিবারের কেউ নয়। পরিবারে মোট চারজন সদস্য–বাবা, মা, ভাই আর বোন। তাহলে কে চালাচ্ছে ক্যামেরা?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রইল চার গোয়েন্দা। সূত্র বের করার আশায়।

'আরও একটা ব্যাপার,' আবার বলল কিশোর। 'ক্যামেরাম্যানের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না কেউ। ওর দিকে হাত নাড়ছে না। পুরোপুরি ওকে উপেক্ষা করছে যেন সবাই। কিংবা জানেই না লোকটা আছে ওখানে। অদ্ভুত কাণ্ড না?'

'ভূতুড়ে কাণ্ড সব সময়ই অদ্ভুত হয়।' জবাব দিল মুসা। 'এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে।'

আবার ঘরে ঢুকল ছেলেমেয়ে দুটো। ছেলেটার হাতে একটা ভিডিও ক্যাসেট। টেলিভিশনের নিচে রাখা ভিসিআরের দিকে এগিয়ে গেল।

'আচ্ছা,' ডন বলল, 'আমরা উঠে যাইনি তো ওদের ক্যাসেটে?'

কোন কিছু নিয়ে তর্ক করছে দু' ভাইবোন। কিন্তু কি বলছে বোঝা গেল না। টেলিভিশনের সামনে মেঝেতে বসে পড়ল দুজনে।

'দেখো দেখো!' চিৎকার করে উঠল রবিন। প্রবল আগ্রহে বকের মত গলা বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে।

কিশোরও দেখল। ও বাড়ির ভিসিআরটাতে ঘড়ির জায়গায় একটা শব্দই জ্বলছে নিভছে: কিল...কিল...কিল...। নিজেদের তর্কে ব্যস্ত থাকায় এখনও সেটা চোখে পড়েনি ছেলেমেয়ে দুটোর।

ভিসিআরে ক্যাসেট ঢোকাতে হাত বাড়াল ছেলেটা। তর্কে ব্যস্ত থাকাতেই বোধহয় এখনও লক্ষ করেনি লেখাটা। ক্যাসেটের সঙ্গে ভিসিআরের ছোঁয়া লাগতেই তীব্র নীল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। চিৎকার করে উঠল ছেলেটা।

'বাবা!' মেয়েটাও চেঁচিয়ে উঠল। 'জিমি শক খেয়েছে!'

গোঙানি, চিৎকার আর ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল গোয়েন্দারা। কিন্তু কি ঘটছে, দেখল না। কারণ ক্যামেরার চোখ এখন টেবিলে ফেলে রাখা খবরের কাগজটার ওপর স্থির হয়ে আছে।

হাঁ হয়ে গেছে রবিন। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। চিৎকার করে উঠল, 'ওটা আজকের কাগজ! আমাদের বাড়িতে এই পত্রিকাটাই রাখে। সকালে দেখে এসেছি।'

পত্রিকাটা কিশোরদের বাড়িতেও রাখা হয়। একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না সে। লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল।

পত্রিকার পাতায় একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে গেল কিশোর, রবিনের কথা ঠিক।

ছয়

'অসম্ভব!' কোনোমতেই মেনে নিতে রাজি না রবিন।

'মানতে তো আমিও পারছি না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আমরা ক্যামেরাটা দিয়ে শুট করতে গেলেই যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে, এর কি ব্যাখ্যা?'

বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে কথা বলছে ওরা। ক্যামেরাটা রাখা কিশোরের পাশে। জিনিসটা ওকে ভয়ানক অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

'তারমানে, তোমার ব্যাখ্যা হলো, ক্যামেরাটা আগে যাদের ছিল তাদের ছবিই তুলে যাচ্ছে?' মুসার প্রশ্ন। 'কিন্তু তোমাদের বাড়িতে, তোমার হাতে থেকে, তোমার ক্যাসেট ব্যবহার করে কিভাবে ও বাড়ির ছবি তুলছে? কোনো যুক্তিতেই তো সেটা মেলে না।'

'সত্যিই মগজ গরম করে দেয়ার মত ব্যাপার!' কিশোর বলল। 'মিনি কম্পিউটারে স্টোর করে রাখা পুরানো ছবি যে উঠছে না, ওই পত্রিকাটাই তার প্রমাণ। ওটা আজকের পত্রিকা। এই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে গেলেই ও বাড়ির ছবি উঠে যাচ্ছে। লেন্স দিয়ে কেবল ওই বাড়ি আর ওই বাড়ির লোকগুলোকেই যেন দেখতে পায় ক্যামেরাটা।'

'কি জানি!' মাথা চুলকাল মুসা। 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না!'

ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করল কিশোর। আর দশটা সাধারণ ভিডিও ক্যামেরার মতই দেখতে। কিন্তু এ রকম করছে কেন? এটার কাজকারবার দেখে তো ভূতুড়েই মনে হচ্ছে।

'ভেতরের কম্পিউটারটাই সম্ভবত যত নষ্টের মূল,' রবিন বলল। 'ওটাকে এ ভাবেই প্রোগ্রামিং করে দিয়েছেন ছবির ভদ্রলোক, যাতে নিজেদের ছাড়া আর কারও ছবি তুলতে না পারে।'

'এটাও একটা অসম্ভব কথা!' মানতে পারল না কিশোর। 'কম্পিউটারের অনেক ক্ষমতা, বুঝলাম। কিন্তু কম্পিউটারও অসম্ভব কোনো কাণ্ড ঘটাতে পারে না। যে জিনিসের ছবিই দেখছে না সেটা তুলছে কি করে ক্যামেরার মিনি কম্পিউটার? একটা উপায়েই কেবল সম্ভব—ওটাতে যদি রিসিভার থাকে, আর সেই

রিসিভারে সারাক্ষণ সিগন্যাল পাঠিয়ে যেতে থাকে কেউ।'

হাতের ক্যামেরাটার দিকে তাকাল আবার। যেন ওটার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে, অদ্ভুত কী উপায়ে এই অঘটনটা ঘটাচ্ছে ওটা!

সহকারীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যামেরার চোখ সারা ঘরে কি ভাবে ঘুরেছে, মনে করে দেখো। ক্যামেরাটা কার হাতে ছিল, সেটা আমরা জানি না। তার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি ঘরের ভেতর।'

'ভূত যে, এটাই তো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ!' মুসা বলল।

*

'ক্যামেরাটা কোথায় পেলে, চাচা?' সেরাতে খাবার টেবিলে বসে আবার চাচাকে একই প্রশ্ন করল কিশোর।

অবাক হলেন রাশেদ পাশা। 'বললাম না, ওই দোকানটা থেকে। পুরানো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করে ওরা। আমি গিয়েছিলাম একটা কম্পিউটারের মনিটর কিনতে। মনিটর পাইনি, তবে এক বাক্স পুরানো মাল পেয়েছি। দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। বাক্স সহ কিনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু বার বার এক কথা জানতে চাইছিস কেন?'

কিশোরের চোখে চোখে তাকাল টেবিলের ওপাশে বসা ডন।

চাচার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে ক্যামেরাটা ছাড়া বাক্সে আরও অনেক জিনিস ছিল?'

'হ্যাঁ,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাতিজাকে দেখতে দেখতে জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'এখনও আছে। এমন সব জিনিস, দেখলে চোখ কপালে উঠে যাবে তোর। অদ্ভুত কায়দায় তৈরি। কারও চোখে পড়ে গেলে যা দাম চাইব তাতেই কিনে নেবে। বসার ঘরের স্টেরিও সেট আর কর্ডলেস টেলিফোনটা তো দেখেছিস। ফোনটা খুলে দেখেছি। একটা বিল্ট-ইন অ্যানসারিং মেশিন রয়েছে ওতে। আরও কিছু যন্ত্রপাতি আছে, যেগুলো চিনতে পারলাম না। আর ওই যে অটোম্যাটিক কফি মেকারটা,' হাত তুলে কিচেন কাউন্টারের ওপর রাখা বিশাল কালো যন্ত্রটা দেখালেন তিনি, 'ওটাও ওখান থেকেই এনেছি। দেখ, খুদে খুদে আলোগুলো কেমন সারাক্ষণ মিটমিট করে চলেছে। দেখে মনে হয় কোথাও থেকে সিগন্যাল রিসিভ করছে।'

ভাতিজার দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'এমন সব জিনিস দেখলে লোভ সামলানো কঠিনই, কি বলিস। সমস্ত জিনিসের বাইরের চেহারা পুরানো মডেলের, অথচ ভেতরের যন্ত্রপাতি সব অত্যাধুনিক। সব কিছু অটোম্যাটিক।'

কফি মেকারটার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। আলোগুলোর মিটমিট করা বাদে ওটাতে রহস্যময় কোনো কিছুই চোখে পড়ল না তার।

সাত

রাতে চাচার নাক ডাকানো শুরু করার আগে আর ঘর থেকে বেরোল না কিশোর। টেলিভিশন দেখে সবার পরে ঘুমাতে গেছেন তিনি। ক্যামেরাটা নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে বসার ঘরে চলে এল সে। আলো জ্বালল না। ও কি করছে, জানতে দিতে চায় না কাউকে। ক্যামেরাটা তুলে ধরল। মাঝরাতে এই অন্ধকারের মধ্যে সত্যিই ভূতুড়ে লাগছে ওটাকে। কিন্তু যত ভূতুড়েই লাগুক, যা করতে এসেছে সেটা না করে যাবে না। ও দেখতে চায়, ও যা ভাবছে সত্যি সত্যি ক্যামেরাটা তা করে কিনা।

লেন্সের ক্যাপটা সরাল সে। 'পাওয়ার' বাটনটা টিপে দিল। ছোট্ট একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। ক্যামেরাটা কাঁধে বসাল সে। বড় করে দম নিল। রেকর্ড বাটন টিপে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে আনল আধপাক। শক্ত করে ধরে রেখেছে।

যতটা সম্ভব ধীরে ঘোরাচ্ছে ক্যামেরা, যাতে ছবি না কাঁপে। ভেতরে যন্ত্রপাতি চলার ঝিরঝির শব্দ কানে আসছে। পুরো চক্করটা শেষ করে তারপর রেকর্ড করা বন্ধ করল।

ক্যামেরাটা নিয়ে গিয়ে বসল টেলিভিশনের সামনে, মেঝেতে। সুইচ অন করে ভলিউম একেবারে কমিয়ে দিল, যাতে শব্দ শুনে বাড়ির কেউ আবার জেগে না যায়। ক্যামেরা থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে ভিসিআরে ঢোকাল। ফিতেটা শুরুতে নিয়ে আসার জন্যে রিওয়াইন্ড বাটন টিপল।

বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। কি দেখতে পাবে?

শুরুতে চলে এল ফিতেটা। প্লে বাটনটা টেপার সময় নিজের অজান্তেই দম আটকে ফেলল সে।

টেলিভিশনে আবছা অন্ধকার একটা ঘর দেখা গেল। যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে, সেটাও বসার ঘর। কিন্তু ওদের ঘরটা নয়। অন্ধকারের মধ্যেও ঘরের টিভিটা দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরার চোখটা ঘোরার সময় টেলিভিশনটা শব্দ করছে বলে মনে হলো তার।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে বোঝাই ঘর। স্টেরিও সেট, অনেকগুলো ঘড়ি, একটা ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার, একটা কম্পিউটার টার্মিনাল, আরও নানা রকম জিনিস—কিছু কিছু চেনে; বেশির ভাগই চেনে না। লাল-নীল বাতি মিটমিট করছে অন্ধকারে, কোন কোনটা জ্বলছে-নিভছে, যেন সঙ্কেত দিচ্ছে পরস্পরকে। হঠাৎ করে জলা-নিভা শুরু করে দিল একটা টেবিল ল্যাম্প। ও বাড়ির টেলিভিশনের

পর্দাটাও একই কাণ্ড শুরু করল। যখন স্থির হলো, পর্দায় ফুটতে শুরু করল বিচিত্র সব সাঙ্কেতিক চিহ্ন আর অঙ্কের সংখ্যা। সেগুলো সরে গিয়ে বড় বড় অক্ষরে দু'বার ফুটল ইংরেজি 'কিল' শব্দটা। তারপর নিভে গেল পর্দার আলো।

নিজেদের টেলিভিশনের ভলিউম বাড়িয়ে দিল কিশোর। শব্দ শোনার আশায়। শোনা গেল। তবে কথা নয়। বিচিত্র সব শব্দ। গুঞ্জন, কিরকির, টিট-টিট, ঝিরঝির। সবই ইলেকট্রিক্যাল কিংবা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের শব্দ।

দ্রুত নেমে এল সামনের জানালায় লাগানো ধাতব খড়খড়ি। জানালাটা ঢেকে দিয়ে আটকে গেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ঘরের আলোর সুইচগুলোও যেন অদৃশ্য হাতের স্পর্শে অন হয়ে গেল। কোণের দিকে একটা ক্যামেরা বসানো। সার্চ লাইটের মত ঘরের এক পাশ থেকে আরেক পাশে আপনাআপনি ঘুরে যাচ্ছে ক্যামেরার চোখ। ঘরের প্রতিটি জিনিসকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ ছবি চলে গেল টেলিভিশন থেকে। তারপর শুধুই ঝিরিঝিরি। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। প্রমাণ হয়ে গেছে। ও যা ভেবেছিল, তাই। যতবার ক্যামেরাটা ব্যবহার করে ওরা, ততবারই অন্য বাড়ির ছবি তুলে ফেলে ওটা। এখানে যে ঘরের ছবি তোলে, ওখানেও সে-ঘরের। আশ্চর্য!

টেলিভিশনের শূন্য পর্দার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। ক্যামেরার কাজই হলো, যে জিনিসের দিকে ফোকাস করা হবে, তার ছবি তুলবে। এটাও তা-ই করে। তবে অন্য বাড়িতে ফোকাস করে। কিভাবে সম্ভব? ভূতুড়ে কাণ্ড ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে এর?

কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করে না কিশোর। ভয়ানক কিছু একটা ঘটছে। তার মনে হতে লাগল, যা ঘটার ও বাড়িটাতেই ঘটছে। এখানে বসে ক্যামেরায় তার ছবি পাওয়া যাচ্ছে কেবল। হঠাৎ করে মনে হলো, ও বাড়ির লোকগুলো বিপদের মধ্যে নেই তো?

টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফোন বাজল।

এত রাতে কে?

রান্নাঘরে ঢুকে এক্সটেনশন লাইনের রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল। হালো হালো করল। কিন্তু কারও সাড়া নেই। ডায়াল টোন শুনে বোঝা গেল, এটা বাজেনি। কিংবা ধরার আগেই লাইন কেটে দিয়েছে।

আবার বাজল ফোন। বসার ঘরে।

তাড়াতাড়ি বসার ঘরে ঢুকল আবার সে। কর্ডলেস টেলিফোনটা বাজছে। ভূতুড়ে ক্যামেরা আর অন্যান্য পুরানো মালের সঙ্গে চাচা যেটা কিনে এনেছেন।

রিসিভার তুলল কিশোর। কানে ঠেকাতেই ভেসে এল একটা হিসহিসে কণ্ঠ, 'কোথায় তুমি?'

মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল যেন কিশোরের। মানুষের কণ্ঠ না ওটা।
'কে কথা বলছেন?' গলা কাঁপছে ওর।
'তুমি জানো না?' পাল্টা প্রশ্ন করল কণ্ঠটা।
'আপনি কে?'
'সেটা না জানলেও চলবে,' জবাব দিল কণ্ঠটা। 'একটা উপদেশ শোনো, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো বিপজ্জনক।'
কট করে শব্দ হলো। কেটে গেল লাইন। ফিরে এল ডায়াল টোন।

*

ঘরে ফিরে এল কিশোর। বিছানায় শুয়েও আর ঘুম আসতে চাইল না। সারাক্ষণই চোখের সামনে ভাসছে একটা বসার ঘর, নানা রকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ভরা। গভীর রাতে নীরবতার মধ্যে অনেক ধরনের শব্দ হয়। খুব সামান্য শব্দও বেশি হয়ে কানে বাজে। অন্য দিন হলে পাত্তাই দিত না। কিন্তু আজ সে-সব শব্দই পীড়া দিতে থাকল ওকে। সামান্যতম শব্দও চমকে দিচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে নিচের বসার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অশরীরী ভয়ঙ্কর কোন কিছু।
গড়িয়ে কাত হলো। ড্রেসারের ওপর রাখা ভূতুড়ে ক্যামেরাটার দিকে তাকাল। অন্ধকারেও ওটার অবয়ব দেখা যাচ্ছে। নাহ্, ঘরে আনাটাই ভুল হয়ে গেছে! নিচেব লিভিং রুমে ফেলে আসা উচিত ছিল। ওটার দিকে তাকালেই গা ছমছম করে।
যেন ওর মনের কথা পড়তে পেরেই ওকে আরও বেশি ভয় দেখানোর জন্যে ক্যামেরার ওপরে বসানো লাল আলোটা জ্বলে উঠল।
'অন' হয়ে গেল ক্যামেরা। আপনাআপনি।

আট

বাকি রাতটা ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুমাল কিশোর। বিছানা ছাড়তে ছাড়তে দশটা বেজে গেল। নিচে নামল ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে। বসার ঘরে ডনকে দেখল টেলিভিশনের সামনে। খিদে পেয়েছে। তাই সোজা এসে রান্নাঘরে ঢুকল সে। ক্যামেরাটা রাখল কাউন্টারের ওপর। এতদিনে এই প্রথম মনে পড়ল, লেন্সের-ক্যাপটা নেই।
তরল কিছু দিয়ে গলা ভেজাতে চাইল প্রথমে। বোতলে দুধ পেল না। কমলার রসও নেই। চাচীকে দেখল না কোথাও। বোধহয় নিজের অফিসে।
শুধু পানি দিয়েই গলা ভিজিয়ে নিয়ে স্যান্ডউইচ বানানোর জন্যে পাঁউরুটি

বের করল কিশোর। টেবিলের একপাশে রাখা একটা বৈদ্যুতিক ছুরি। রুটির মত নরম জিনিস কাটতে ওটার প্রয়োজন নেই।

সাধারণ রুটি কাটার ছুরি দিয়ে এক টুকরো রুটি কেটে নিয়ে মাখন মাখাতে শুরু করল সে। মন নেই তাতে। মগজে এখনও গতরাতের দৃশ্যগুলো ঘোরাফেরা করছে। অন্য পরিবারটার কথা ভাবছে। বোঝার চেষ্টা করছে কি বিপদ রয়েছে ওদের সামনে। নিজেকে ওই বাড়ির লোক কল্পনা করে অনুমান করতে চাইল কি ধরনের বিপদ আসতে পারে। যাদের চেনেই না তাদের কি বিপদ হবে, কি করে বুঝবে এখানে বসে?

শব্দ শুনে ক্যামেরাটার দিকে ফিরে তাকাল। স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। জ্বলে উঠেছে 'অন' সুইচের লাল আলোটা। গুঞ্জন কানে আসছে। মোটরের শব্দ। কিন্তু ক্যামেরাটার নয়।

ঝট করে চোখ চলে গেল বৈদ্যুতিক ছুরিটার ওপর। ওটার মোটরই চালু হয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসছে ওর দিকে।

চোখের পলকে কাত হয়ে গেল কিশোর। পড়ে গেল চেয়ার থেকে মেঝেতে। একটা মুহূর্ত দেরি করলেই সোজা বুকে বিঁধত ছুরি। ওকে না পেয়ে চেয়ারের হেলানে গিয়ে বিঁধল। থিরথির করে কাঁপতে লাগল। পুরো একটা মিনিট চালু রইল ওটার মোটর। কোনো দিকে নড়তে না পেরেই যেন প্রচণ্ড আক্রোশে গুঞ্জন বেড়ে গেল মোটরের। তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

চট করে ক্যামেরার দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। নিভে গেছে 'অন' সুইচের লাল আলো।

শব্দ শুনে ঘরে ঢুকলেন চাচী।

চেয়ারে গাঁথা ছুরিটা দেখিয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বলল কিশোর। তিনি কি বুঝলেন তিনিই জানেন। চেয়ার থেকে ছুরিটা খুলে নিয়ে ফেলে দিলেন ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। তারপর এসে কিশোরকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন কয়েকটা সেকেন্ড। কাঁপছেন রীতিমত।

'ওই ছুরিটা তো আগে কখনও দেখিনি,' চাচীকে বলল কিশোর। 'এল কোত্থেকে ওটা?' প্রশ্নটা করেই বুঝল কোথা থেকে এসেছে। চাচা এনেছে! বাক্সের পুরানো জিনিসগুলোর মধ্যে ছিল, ওই ক্যামেরাটার সঙ্গে!

*

'হ্যাঁ, ওই ফোনটা ছাড়া আর কোনোটা বাজেনি,' রাতের পর থেকে যা যা ঘটেছে, সহকারীদেরকে সব খুলে বলার পর বলল কিশোর। 'বুঝে দেখো অবস্থাটা। রাতে আমি তুললাম ছবি, উঠে গেল ও বাড়ির ছবি। তারমানে এখানে বসে ওদের ঘরের ছবি তুলছি আমরা।'

'পুরানো কথা,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'নতুন কিছু বলো।'

লাঞ্চের পর এসে ওঅর্কশপের ছাউনির বাইরের ছায়ায় বসেছে তিন গোয়েন্দা ও ডন। বেশ গরম পড়েছে।

চাচা-চাচী বাড়ি নেই। জরুরি কাজে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে।

'তারমানে প্রমাণিত হয়ে গেল, যে জায়গার ছবি তুলব আমরা, উঠবে ওবাড়ির ওই জায়গার ছবি,' রবিন বলল। 'তো এখন কি করতে চাও?'

'বুঝতে পারছি না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে দু'বার চিমটি কাটল কিশোর। গভীর চিন্তা চলেছে মগজে। 'সবচেয়ে সহজ হয়, চাচী যেমন ছুরিটা ফেলে দিয়েছে, আমিও ক্যামেরাটা ফেলে দিলে। কিন্তু পারব না। রহস্যটার সমাধান করতেই হবে। তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছে ও-বাড়ির মানুষগুলো। খুনে কোনো কিছু ওদের পেছনে লেগেছে। আমি দূরে ছিলাম, আমাকেই ছাড়েনি, ইলেকট্রিক নাইফ দিয়ে খুন করে ফেলেছিল আরেকটু হলেই। কতটা ক্ষমতাশালী কল্পনা করতে পারো!'

'ভূতের শক্তি কল্পনা করা কঠিন,' মুসা বলল।

'কি ভূত-ভূত করছ! আমি এর মধ্যে ভূত দেখতে পাচ্ছি না।'

'তাহলে কি?'

'সেটাই তো জানার চেষ্টা করতে হবে।'

'কিভাবে?'

'এক কাজ করা যায়,' রবিন বলল। 'রাশেদ আঙ্কেল যে দোকান থেকে জিনিসগুলো কিনেছেন, সে-দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো জানা যায় কার কাছ থেকে ওগুলো কিনেছিল ওরা।'

নির্বিকার ভঙ্গিতে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। রবিনের উত্তেজনাটাকে ফুটো বেলুনের মত চুপসে দিয়ে বলল, 'জিজ্ঞেস করেছি। ছুরিটা ওখান থেকে এসেছে জানার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ফোন করেছিলাম দোকানে। ওরা বলল, কার কাছ থেকে কোন জিনিস কেনে, রেকর্ড রাখে না ওরা। কোনো তথ্যই দিতে পারল না।'

বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছে ডন। উঠে চলে গেল। পুরানো একটা দোলনা পেয়েছে জঞ্জালের মধ্যে। সেটা ঝোলানোর ব্যবস্থা করেছে ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী ব্যাভারিয়ান দুই ভাই বোরিস আর রোভারের সহায়তায়। দোলনায় চড়ে দোল খাওয়া শুরু করল সে। কান রয়েছে তিন গোয়েন্দার কথার দিকে।

'তাহলে ওরা কোথায় থাকে কিভাবে জানব? ওদের ঠিকানা না পেলে এ রহস্যের সমাধান সম্ভব না।'

তিনজনে মিলে ভেবেও কোনো কূল-কিনার করতে পারল না। মুসা ভাবছে। রবিন ভাবছে। কিশোর তো ভাবছেই। এমনকি দোলনায় বসা ডনও দোল খেতে খেতে ভাবছে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন: কিভাবে জানা যাবে বাড়িটার ঠিকানা?

'আমাদের তোলা ছবিগুলো আরেকবার দেখলে কেমন হয়?' রবিন বলল অবশেষে। 'ভাল করে আবার দেখলে কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

'ঠিক!' চেঁচিয়ে উঠল ডন। উত্তেজনার বশে দোলনার শিকল ছেড়ে দিয়ে আরেকটু হলেই উল্টে পড়েছিল। থাবা দিয়ে ধরে ফেলল শিকল। 'তবে পুরানো ছবি দেখার চেয়ে নতুন ছবি তোলা ভাল।'

ডনের দিকে তাকাল কিশোর। 'মানে?'

'ক্যামেরাটা যদি ওদের বাড়িঘরের ছবি তুলতে পারে, ফোনটার ছবি তুলতে পারবে না কেন? অনেকেই ফোনের সেটের গায়ে নম্বর লিখে রাখে। আমাদেরটার যেমন রাখি।'

আলো জ্বলল কিশোরের চোখে। 'মন্দ বলনি। আমাদের ফোনটার ছবি তুলব, তাতে হয়তো ওদের ফোনটার ছবি উঠে যাবে। আর তাতে নম্বর থাকলে...' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই, চলো তো!'

ওবাড়ির ছবি দেখার ভাল একটা বুদ্ধি বের করল মুসা। কিশোরকে বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের টেলিভিশনটার সঙ্গে ফিট করে দেয়া যায় না ক্যামেরাটা? তাহলে আর ক্যাসেটে রেকর্ড করার ঝামেলা থাকবে না। ক্যামেরার চোখ ছবি রিসিভ করে টেলিভিশনে পাঠাবে, পর্দায় ছবি ফুটবে, সরাসরি দেখতে পাব আমরা।'

'ঠিক বলেছ!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। 'সবার মাথাই খুলে যাচ্ছে দেখি আজ, শুধু আমারটা ছাড়া। চলো চলো!'

নয়

যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভাল লাগে মুসার। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে টেলিভিশনের ব্যাক কভারের স্ক্রু খুলতে শুরু করল সে। অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে কিশোর। টেলিভিশনটা নষ্ট করলে চাচীর বকা খেতে হবে। টেলিভিশনে হাই ভোল্টেজ চালু থাকে। মুসা যদি শক খায়, তাহলেও দোষটা কিশোরের ঘাড়েই পড়বে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় দেখছে না। মুসাকে সাবধান করল সে,'দেখো, কারেন্টে হাত দিয়ো না!'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল মুসা।

'নাহ্, পাওয়ার লাইনের প্লাগটা বরং খুলেই দিই,' ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কিশোর।

'আরে কি অত ভাবছ!' মুসা বলল। 'শুধু তো অ্যান্টেনার লাইনটা খুলব। ওই লাইনে অত কারেন্ট থাকে না।'

থাকে না যে কিশোরও জানে। তবু সাবধানের মার নেই।

সেটের পেছনের ডালাটা খুলে নামিয়ে রাখল মুসা। তারপর অ্যান্টেনার লাইনে যুক্ত করে দিল ভিডিও ক্যামেরার কর্ড। 'টিভির সুইচ অন করো। ভিসিআরের চ্যানেলে তো নিশ্চয় ছবি আসবে না?'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'তাহলে টিউন করো।'

টেলিভিশনের সুইচ অন করে 'জিরো' চ্যানেলে দিল কিশোর। জোরে শাঁ-শাঁ শব্দ করে উঠল স্পীকার। তাড়াতাড়ি ভলিউম কমিয়ে দিল। রবিনকে ক্যামেরা অন করতে বলে ক্যামেরার ছবি আনার জন্যে টিউন করতে লাগল।

ক্যামেরার পাওয়ার বাটন টিপল রবিন। টেলিভিশনের পর্দার ঝিরিঝিরি চলে গিয়ে ঝাঁকি দিল বার দুই। তারপর ছবি ফুটল। গলা বাড়িয়ে এসে পর্দা দেখার জন্যে উঁকি দিল টেলিভিশনের পেছনে দাঁড়ানো মুসা।

ক্যামেরাটা কোলে নিয়ে মেঝেতে বসেছে রবিন।

রান্নাঘরের দরজার দিকে ক্যামেরার লেন্স। টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে চার জোড়া চোখ। পর্দায় একটা দরজা দেখা গেল। কিশোরদেরটা নয়, অন্য বাড়িটার।

'হয়ে গেছে কাজ!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

ক্যামেরাটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন।

অদ্ভুত দৃশ্য। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে কিশোরের, যদিও জানত এ রকমই কিছু ঘটবে। এক ধরনের অস্বস্তি।

রবিন যখন কিশোরদের বসার ঘরের দিকে ক্যামেরার চোখ ঘোরাচ্ছে, টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে অন্য বাড়িটার বসার ঘর। ছাতের দিকে ঘোরালে, অন্য বাড়ির ছাত। কিশোররা ঘরের যেখানে সোফা রেখেছে, ওই বাড়ির লোকেরাও ওখানেই রেখেছে। তবে সোফাগুলো অন্য রকম। সোফার দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে কিশোরদের বাড়িতে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, অন্য বাড়িটাতে পড়ে অন্য রকম। মেরিচাচী ঘরের যেখানটাতে চীনা মাটির জিনিস সাজিয়ে রাখার ক্যাবিনেট রেখেছেন, ওরা সেখানে রেখেছে একটা বুককেস, কম্পিউটারের ওপর লেখা বইতে বোঝাই। এ ছাড়া রয়েছে প্রচুর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কিশোরদের ঘরে যে সবের কিছু কিছু আছে, বেশির ভাগই নেই।

টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল মুসা, 'খাইছে! এত যন্ত্রপাতি তো কারও বাড়িতে জীবনে দেখিনি!'

ও বাড়িতে কোনো মানুষজন দেখা গেল না। কারও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

বাড়িতে নেই বোধহয় ওরা।

'ফোনটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো,' রবিনকে বলল মুসা।

ধীরে ধীরে বসার ঘরের দিকে লেন্স তাক করে ক্যামেরাটা ঘোরাতে লাগল রবিন। ঘরের প্রতিটি জিনিসের ওপর ফেলতে লাগল ক্যামেরার চোখ। সে আর এখন টেলিভিশনের দিকে তাকানোর সুযোগ পাচ্ছে না। তবে কিশোর, মুসা আর ডনের তিন জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি টেলিভিশনের পর্দায় স্থির। অতি সামান্য জিনিসের ছবিও চোখ এড়াতে দিতে রাজি না।

টেলিভিশনের পর্দায় আঙুল রেখে আচমকা চিৎকার করে উঠল ডন, 'ওই যে! ফোন! রবিন ভাই, টেবিলের ওপর!'

রবিন নড়ে উঠতেই সরে গেল ফোনটা।

রবিনকে নির্দেশ দিল কিশোর, 'দুই কদম আগে বাড়ো!'

দুই কদম এগিয়ে থেমে গেল রবিন। পর্দার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না কিশোর। এখনও দেখা যাচ্ছে না টেলিফোনটা।

'আধা কদম বাঁয়ে সরো!'

সরল রবিন। টেলিফোনটা দেখা গেল টেলিভিশনের পর্দার একেবারে নিচের রেখার কাছে।

'সামান্য নামাও তো,' কিশোর বলল। 'আরেকটু। আরও একটু। থামো। হ্যাঁ, হয়েছে। ধরে রাখো।'

টেলিভিশনের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মুসা। পর্দার একেবারে সামনে চোখ নিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'নাহ্, ফোনের গায়ে নম্বর লেখা নেই!'

'এক্সটেনশন নিশ্চয় আছে,' অত সহজে হাল ছাড়তে রাজি না কিশোর। 'আরেকটা ফোন খুঁজে বের করো। রান্নাঘরে এক্সটেনশন আছে নাকি দেখো।'

রান্নাঘরের দরজার দিকে এগোল রবিন।

টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সেই রান্নাঘরটার ছবি ফুটল, সেদিন যেটা দেখেছিল, যেটাতে জন্মদিনের পার্টি করছিল ওবাড়ির লোকেরা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সিংকের ওপরে রাখা অধোয়া বাসন-কোসনগুলোও দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

'কাজটা করা কি ঠিক হচ্ছে?' কিশোরের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'চুরি করে অন্যের বাড়ির ভেতর উঁকি মারা?'

'ওদের ভালর জন্যেই দেখছি,' মুসা বলল। 'তুমিই তো বললে, ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছে ওরা।'

টানটান হয়ে গেছে টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত ক্যামেরার কর্ডটা। পর্দার দিকে তাকাল কিশোর। আরেকটা ফোন দেখতে পেল রান্নাঘরের শেষ প্রান্তে।

'ওই যে,' আঙুল তুলে দেখাল সে। 'আমাদের টোস্টারটা যেখানে রাখা, ওদের ফোনটা রয়েছে সেখানে।'

আগে বাড়তে গেল রবিন। টান লেগে ক্যামেরার পেছন থেকে খুলে চলে এল সকেটে লাগানো অডিও-ভিডিও কর্ড। টেলিভিশন থেকে ছবি চলে গেল। শুধু ঝিরিঝিরি আর শাঁ-শাঁ শব্দ।

পিছিয়ে এল রবিন।

তাড়াতাড়ি কর্ডটা তুলে ক্যামেরার সকেটে লাগিয়ে দিল কিশোর।

'এগোনো তো যাচ্ছে না। কর্ডে কুলোচ্ছে না,' রবিন বলল। 'কি করব?'

'এখানে দাঁড়িয়েই জুম করো,' কিশোর বলল। 'লেন্সে লাগানো নবটা ঘোরাও।'

ফিরে গিয়ে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখল আবার কিশোর। হঠাৎ লাফ দিয়ে সামনে চলে এল রান্নাঘরের দূরবর্তী প্রান্তটা। জুম করাতে ছবি ওঠা-নামা করছে, স্থির হতে চাইছে না। পর্দার নিচের অংশে পলকের জন্যে টেলিফোন সেটটা চোখে পড়ল কিশোরের। আবার চলে গেল।

'আরও আস্তে,' রবিনকে বলল কিশোর। 'শক্ত করে ক্যামেরাটা ধরো। নিচে নামাও। খুব ধীরে ধীরে।'

'চেষ্টা তো করছি,' রবিন বলল। 'কোনোমতেই এক জায়গায় স্থির রাখতে পারছি না। তারমানে ক্যামেরা চালানো খুব কঠিন; আসলে প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো কাজই সম্ভব না।'

'যা পারছ তাতেই চলবে। আরেকটু নামাও।' বলেই, 'হয়েছে হয়েছে!' বলে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

টিভি পর্দার একেবারে মাঝখানে দেখা যাচ্ছে এখন টেলিফোন সেটটা।

'রাখো, এখানেই রাখো!' কিশোর বলল। 'একেবারে নড়বে না।'

টেলিভিশনের পর্দায় প্রায় নাক ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ল সে। ফোনটা ধীরে ধীরে নড়ে বেড়াচ্ছে পর্দার গায়ে। যতটা সম্ভব স্থির হয়ে আছে রবিন, তারপরেও নিঃশ্বাসের সময় হাত ও কাঁধ যেটুকু কাঁপছে, তাতেই নড়ে যাচ্ছে ছবি। দম আটকে ফেলল সে।

'নাহ্,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, 'এটাতেও নেই!'

চেপে রাখা বাতাসটুকু ফোঁস করে ফুসফুস থেকে ছেড়ে দিল রবিন। কিশোরের দিকে তাকাল। 'এখন কি?'

সমাধানটা এবারেও মুসাই দিল। মাঝে মাঝে মগজ খুলে যায় তার। 'আরও টেলিভিশন আছে এ বাড়িতে। আঙ্কেলের স্টাডিরটাতে গিয়ে লাগালে কেমন হয়?'

'চাচারটাতে?' চিন্তা করছে কিশোর। 'বুঝতে পারছি না। আসলে, অন্যের বাড়িতে এ ভাবে উঁকি মারাটাই পছন্দ হচ্ছে না আমার। মানুষের কত গোপনীয়তা,

থাকে। তোমার বাড়িতে যদি এ ভাবে উঁকি মারতে থাকে কেউ, তোমার কেমন লাগবে?'

একটা মুহূর্তের জন্যে মুখ বন্ধ হয়ে গেল সবার। ক্যামেরার সুইচ অফ করে দিল রবিন। কালো হয়ে গেল টেলিভিশনের পর্দা।

রবিন বলল, 'আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে আমাদের সারা বাড়িতেও যদি কেউ উঁকি মারে, আমি কিছু মনে করব না। তুমি?'

কিশোরও ভেবে দেখল। রবিন ঠিকই বলেছে। অস্বস্তি আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুসাকে কর্ড খুলতে বলল।

*

'হ্যাঁ, হয়েছে,' রাশেদ পাশার স্টাডির ছোট টেলিভিশনটার পেছন থেকে বলল মুসা। 'রবিন, শুরু করো।' এক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল তার বিস্মিত কণ্ঠ, 'খাইছে!'

'কি হলো?' কিশোর বলল। রবিনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। ফিরে তাকাল প্রথমে মুসার হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে। সেখান থেকে টেলিভিশনের পর্দার দিকে।

মুসা কি দেখেছে দেখার জন্যে রবিনও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

প্রথমেই চোখ গেল টেলিভিশনের পর্দার লাল-সবুজ আলোগুলোর দিকে। জ্বলছে-নিভছে। বড় বড় রীলে টেপ ঘুরছে। নানা ধরনের প্যানেল দেখা গেল, সেগুলোতে জ্বলন্ত সংখ্যাগুলো বদল হচ্ছে অনবরত।

'কম্পিউটার না!' বিমূঢ় হয়ে গেছে ডন।

'এত বড় কম্পিউটার তো জিন্দেগিতে দেখিনিরে ভাই!' মুসা বলল। 'এমন চেহারার!'

ঘরের চারপাশে ক্যামেরা ঘোরাতে লাগল রবিন, চোখ টেলিভিশনের পর্দার দিকে। প্রায় পুরোটা ঘর জুড়ে রয়েছে বিস্ময়কর সেই কম্পিউটার। কয়েক ভাগে বিভক্ত। একটা অংশ বড় রিফ্রিজারেটরের সমান। আরেকটা অংশ অনেকগুলো জুতোর বাক্স একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখলে যেমন দেখা যায় তেমন। চারিদিকে তারের ছড়াছড়ি। জট পাকিয়ে আছে। আলো ঝিলিক দিচ্ছে সিগন্যাল বাটনগুলো থেকে। টেপের ফিতার রীল ঘুরছে ইলেকট্রনিক চোখের নিচে। নানা রকম মনিটরে সংখ্যার পর সংখ্যা আসছে আর যাচ্ছে। একটা ছোট টুলে গাদা করে রাখা বেশ কিছু কম্পিউটার ও আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বিষয়ক বই।

বিমূঢ় ভঙ্গিতে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে টেলিভিশনের সামনে দাঁড়ানো মুসা। 'এত বড় কম্পিউটার দিয়ে তো মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র বানানো যাবে। এ জিনিস দিয়ে কি করে ওরা?'

'এখানে ফোন নেই,' মনে করিয়ে দিল ডন। কম্পিউটারটা দেখে আসল

কথাটাই ভুলে গিয়েছিল সবাই।

টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকাল আবার কিশোর। 'ঠিকই বলেছে। মুসা, কর্ডটা খুলে ফেলো।'

আরও একটা জরুরি কথা মনে করিয়ে দিল ডন, 'খাওয়ার কথা ভুলে গেলে নাকি আজ সবাই? মুসা ভাই, তোমারও দেখছি কোনো হুঁশ নেই।'

'ভাল কথা মনে করেছ তো!' মুসা বলল। 'জলদি চলো! আর একটা সেকেন্ড দেরি করা যাবে না।'

ক্যামেরার সুইচ অফ করে দিল রবিন।

টেলিভিশনে ছবি চলে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কিশোরের মনে হলো, 'কিল' শব্দটা ফুটে উঠতে দেখল টেলিভিশনের পর্দায়।

দশ

বসার ঘরে টেলিভিশনের অ্যান্টেনার তার লাগাচ্ছে মুসা, এ সময় বেজে উঠল টেলিফোন। অ্যান্টেনা ধরে রেখেছে কিশোর। এ অবস্থায় ফোন ধরতে পারবে না। রবিন আর ডন রান্নাঘরে স্যান্ডউইচ বানাচ্ছে।

'রবিন, ফোনটা ধরো তো,' ডেকে বলল কিশোর।

'এখানে বাজছে না,' রবিন জানাল।

ভুরু কুঁচকে পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর ও মুসা। রাতের কথা মনে পড়ল কিশোরের।

আবার রিং হতে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল রবিন। তার পেছনে ডন।

রাশেদ পাশা যে কর্ডলেস ফোনটা কিনে এনেছেন, সেটা বাজছে।

'এই ফোনটায় স্পীকার আছে নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সবই আছে,' কিশোর বলল।

'স্পীকারটা অন করে দাও তো, রবিন, সবাই শুনি,' মুসা বলল।

স্পীকার অন করে দিতেই বলে উঠল একটা খনখনে কণ্ঠ। 'হালো! শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি,' জবাব দিল কিশোর।

'কিসের বিরুদ্ধে লেগেছ তোমরা এখনও বুঝতে পারছ না,' কণ্ঠটা বলল। 'যদি নিজেদের ভাল চাও, নাক গলানো বন্ধ করো। নইলে পস্তাবে।'

'হুমকি দিচ্ছেন?'

'না। এটা আমার প্রতিজ্ঞা।'

চুপ করে আছে কিশোর। এরপর কি বলবে ভাবছে। এক এক করে তাকাল তিন সহকারীর মুখের দিকে। অপেক্ষা করছে ওরা। স্পীকারটাও অপেক্ষা করছে। কিশোর বলল, 'আপনার ইচ্ছে জানা হয়ে গেছে আমাদের। জানি, ওদেরকে কি করতে চাইছেন।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কোনো জবাব এল না স্পীকারে। তারপর কণ্ঠটা বলল, 'দেখো, মারাত্মক বিপদে পড়বে বলে দিলাম। অতিরিক্ত নাক গলাচ্ছ। মনে হচ্ছে অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তোমরা। তোমাদের ব্যবস্থা আমি করব।'

নীরব হয়ে গেল টেলিফোন। লাইন কেটে গেছে।

*

রান্নাঘরের টেবিল ঘিরে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে চারজনে। ক্যামেরাটা কিশোরের সামনে রাখা। নীরবে খেয়ে যাচ্ছে ওরা। কথা বলতেও যেন ভয় পাচ্ছে। বার বার ক্যামেরাটার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে কেউ না কেউ। কি করবে এরপর, কি করা উচিত, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

উঠে গিয়ে রিফ্রিজারেটর খুলল ডন। দুধের বোতল বের করল। একটা গ্লাস নিল দুধ ঢালার জন্যে।

স্যান্ডউইচে আরেকবার কামড় বসিয়েছে কিশোর। ঠিক এই সময় জ্বলে উঠল ক্যামেরার পাওয়ার অন সুইচ।

ক্যামেরার চোখ ডনের দিকে। রিফ্রিজারেটরের ডালা বন্ধ করছে সে। টেবিলের দিকে পা বাড়াল। পুরানো মালের দোকান থেকে আনা কফি মেকারটার পাশে কাটাচ্ছে, হঠাৎ হিসিয়ে উঠল ওটা, ফুটন্ত গরম পানির ধারা পিচকারির মত ছুটে এল ডনের মুখ লক্ষ্য করে। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। হাত থেকে গ্লাসটা ছুটে গিয়ে মেঝেতে পড়ে ভাঙল। রান্নাঘরের মেঝেতে ছিটকে পড়ল গরম পানি।

নিভে গেল ক্যামেরার আলো।

পরক্ষণে বেজে উঠল বসার ঘরের টেলিফোনটা।

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল মুসা। হ্যাঁচকা টানে ডনকে সরিয়ে নিল মেঝেতে পড়ে থাকা গরম পানির কাছ থেকে।

কিশোর উঠে দৌড় দিল বসার ঘরে। ফোনের কাছে। পেছন পেছন বেরিয়ে এল অন্য তিনজন। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল ফোনটাকে।

স্পীকারের সুইচ টিপে দিল কিশোর। হাত কাঁপছে।

টেলিফোনে ভেসে এল সেই কণ্ঠটা, 'পরের বার আর মিস করব না!' বলেই নীরব হয়ে গেল।

নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে চার গোয়েন্দা। এখনও কাঁপছে ডন। তাকে কাছে টেনে নিল রবিন। এমন করে রবিনের দিকে তাকাল বেচারা, মনে হলো কেঁদে

পেছনে শব্দ হলো। ভীষণ চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে আধ হাত শূন্যে উঠে গেল কিশোর। চিৎকার করে উঠল রবিন। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা, দুই হাত আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত।

কিন্তু না। শত্রু না। চিঠিপত্র ফেলার ফোকরটা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে এক গাদা চিঠিপত্র আর ম্যাগাজিন।

এগারো

ইলেকট্রনিক্সের দোকান থেকে পুরানো যে সব জিনিস কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা, সবগুলোর পাওয়ার লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিল ওরা। পেন্সিল কাটার, ইলেকট্রিক রেজর, এ সবের ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা আছে বলে মনে হলো না। তারপরেও ঝুঁকি নিল না। সকেট থেকে খুলে ফেলল পাওয়ার লাইনের প্লাগ।

কোনো সন্দেহ নেই আর এখন কিশোরের, ওবাড়ির ওই বিশাল কম্পিউটারটাই ফোন করেছিল ওদেরকে। ভিডিও ক্যামেরাটার সাহায্যে ওদের ওপর চোখ রাখছে ওটা। ও বাড়ির সমস্ত ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র কন্ট্রোল করছে আজব কম্পিউটারটা কোনোভাবে, সম্ভবত রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে। সে-কারণেই ও বাড়ি থেকে বের করে দেয়া পুরানো জিনিসগুলোকেও ওখানে বসেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে ওটা।

কি ভেবে টেলিফোনের প্লাগটা আবার সকেটে ঢুকিয়ে দিল কিশোর। তার মনে হলো ভয়ঙ্কর ওই ঘাতক কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিলে কি করছে ওটা জানতেও পারবে না ওরা, সাবধানও হতে পারবে না।

ওবাড়ির ঠিকানাটা কিভাবে খুঁজে বের করা যায়, বুদ্ধিটা অবশেষে ডনের মাথা থেকেই বেরোল।

এক টুকরো মলাট দিয়ে ক্যামেরার লেন্সটা ঢেকে টেপ দিয়ে আটকে দেয়া হলো। তাতে গোয়েন্দারা কি করছে কম্পিউটারটা আর দেখতে পাবে না।

আবার টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত করা হলো ক্যামেরাটা। আগের মতই ক্যামেরা তুলে নিল রবিন। চিঠি ফেলার ফোকরের দিকে তাক করার আগে ক্যামেরার লেন্স থেকে আর কার্ডবোর্ডটা খুলল না।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে ফুটে উঠল অন্য বাড়িটার ছবি। চিঠি ফেলার ফোকরটা দেখা যাচ্ছে। নিচের দিকে ক্যামেরা তাক করল রবিন। এতক্ষণে বেশ প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। তাতে ছবির অকারণ নড়াচড়া কমে গেছে অনেকখানি।

'বাঁয়ে সরাও, সামান্য,' টেলিভিশনের কাছে বসে পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে নির্দেশ দিচ্ছে কিশোর। 'হ্যাঁ, হয়েছে।...রাখো। নড়াবে না।' এক টুকরো কাগজে খসখস করে লিখে নিয়ে বলল, 'নাও, অঙ্ক করে দাও।'

কিশোর কি লিখেছে দেখার জন্যে তাকে ঘিরে এল সবাই।

কাগজটা দেখাল কিশোর। লিখেছে:

প্রফেসর ওয়াগনার হামফ্রে ডেভিডসন
১১১১১ ওয়েস্ট শোর, ডবকি।

'হুঁ, প্রফেসর!' মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, 'এতক্ষণে বুঝলাম ঘরের মধ্যে অতবড় এক কম্পিউটার বসানোর বুদ্ধি কার মগজ থেকে বেরিয়েছে আর অতগুলো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিই বা কেন। নিশ্চয় উনি ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্সের প্রফেসর। এই কম্পিউটারের ডিজাইনও হয়তো উনি নিজেই করেছেন। বাড়ির সমস্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো নিজের মত করে যুক্ত করে দিয়েছেন কম্পিউটারের সঙ্গে। পুরো বাড়িটাকেই হয়তো চালায় ওই কম্পিউটার, সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'এমনকি রাশেদ আঙ্কেল যেগুলো কিনে এনেছেন, সেগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করে এখনও।'

ক্যামেরা রেখে ফোন বুক নিয়ে এল রবিন। একজন ডব্লিউ. এইচ. ডেভিডসনই পেল নামের তালিকায়, তবে ঠিকানা নেই।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। ভুরু নাচাল। 'এই ভদ্রলোককেই কি খুঁজছি আমরা?'

'এ রকম নাম যেহেতু একটাই আছে,' জবাব দিল কিশোর, 'ইনি ছাড়া আর কে হবেন?'

'ফোন করে দেখব নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'না। করে লাভ নেই। ফোনটা যখন খুঁজছিলাম, বাড়িতে কাউকে দেখিনি।'

'একটা মেসেজ রেখে দিতে পারি, এলেই যাতে ফোন করে আমাদের।'

'করবে না। বোঝাই তো যাচ্ছে ও বাড়ির সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করে ওই কম্পিউটার। ফোনের অ্যানসারিং মেশিনও নিশ্চয় ওটার সঙ্গে যুক্ত। মেসেজ দেবে না। বরং খেপে গিয়ে ক্ষতিও করে বসতে পারে। তারচেয়ে ওদের বাড়ি ফেরার অপেক্ষাই করা উচিত আমাদের।'

'ওরা বাড়ি ফিরল কিনা ফোন না করে জানব কিভাবে?'

নিচের ঠোঁটে দু'তিন বার চিমটি কাটল কিশোর। তারপর তুড়ি বাজাল। রবিনের হাত থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে লেন্সের ওপর কার্ডবোর্ড লাগাল আবার। রান্নাঘরে ঢুকে একটা চেয়ার নিয়ে এল। দরজার পাশের একটা জানালার কাছে নিয়ে গেল চেয়ারটা। এটা সেই চেয়ার, যেটাতে ছুরিটা গেঁথেছিল। ফুটোটায় আঙুল বুলিয়ে আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল কি যেন। মুখ তুলে

তাকাল সঙ্গীদের দিকে। 'কি ভয়ঙ্কর এক কম্পিউটারের পাল্লায় পড়লাম বলো দেখি!'

ক্যামেরাটা চেয়ারের ওপর রাখল সে। চোখটা ঘুরিয়ে দিল জানালার বাইরে গাড়িপথের দিকে। টেলিভিশনের দিকে ফিরে তাকাল। কালো হয়ে আছে পর্দা। লেন্সের ওপর থেকে কার্ডবোর্ড সরিয়ে দিয়ে আবার তাকাল টেলিভিশনের দিকে। ও বাড়ির গাড়িপথটা ফুটে উঠেছে পর্দায়। শূন্য, নির্জন একটা পথের ধারের বাড়ি। জায়গাটাও অচেনা লাগল ওদের কাছে। শহরের অন্য প্রান্তে হতে পারে।

লেন্সের মুখে আবার কার্ডবোর্ড লাগিয়ে দিল কিশোর। বলল, 'কয়েক মিনিট পর পর ওদের ড্রাইভওয়ে চেক করব আমরা। গাড়ি দেখলেই বোঝা যাবে বাড়ি ফিরে এসেছে।'

ক্যামেরাটার দিকে দীর্ঘ একটা মিনিট তাকিয়ে থেকে সবাইকে রান্নাঘরে আসতে ইশারা করল সে। রিফ্রিজারেটরটার কাছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল।

'ডেকে আনলাম কেন জানো? একটা কথা মনে পড়েছে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আমাদের ছবি যেমন দেখে, আমাদের কথাও নিশ্চয় শুনতে পায় কম্পিউটারটা। লেন্সটা যে ভাবে ঢেকে দিতে পেরেছি, মাইক্রোফোনটা পারিনি। কাজেই এখন থেকে সাবধানে কথা বলতে হবে আমাদের যাতে কথার শব্দ কোনোমতেই মাইক্রোফোনের কাছে না পৌঁছায়।'

*

শেষ বিকেলে গাড়িপথে একটা গাড়ি ঢুকতে দেখল ওরা টেলিভিশনের পর্দায়। কার্ডবোর্ড লাগিয়ে লেন্সের চোখ বন্ধ করে দিল আবার কিশোর। বুড়ো আঙুলে ক্যামেরার দিকে ইঙ্গিত করে মুসা আর রবিনকে চোখ টিপল।

আগে থেকেই প্ল্যান করা আছে। ইশারাটা বুঝল দু'জনেই।

জোরে জোরে রবিন বলল, 'ধুর, এ সব আর ভাল্লাগছে না আমার। আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

'চলো, আমিও যাই,' মুসা বলল। 'কিশোর, কাল দেখা হবে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। আঙুলের ইশারায় দরজাটা দেখাল।

বেরিয়ে গেল রবিন। সাইকেলে চেপে চলে গেল গেটের দিকে।

কয়েক মিনিট পরেই বেজে উঠল ফোন। রান্নাঘরে গিয়ে রিসিভার তুলল কিশোর। এখানে কথা বললে ক্যামেরার মাইক্রোফোনে শব্দ পৌঁছবে না। রবিনই করেছে। কোনো পে ফোন থেকে। রিসিভারে ভেসে আসছে যানবাহনের শব্দ।

পে ফোনের নম্বরটা জানাল রবিন। দ্রুত লিখে নিল কিশোর।

'পরিবারটার বাবা কিংবা মা রান্নাঘরে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে,' রবিন বলল। 'নজর রাখতে থাকো। কেউ ঢুকলেই এখানে ফোন করবে আমাকে। শিওর হয়ে ও বাড়িতে ফোন করতে চাই আমি। যাতে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি,

কম্পিউটারটার সঙ্গে নয়।'

রান্নাঘরের দরজার কাছাকাছি ক্যামেরার কর্ড যতখানি যায় ততখানি নিয়ে গেল ওরা। চেয়ারের ওপর বসিয়ে ওবাড়ির রান্নাঘরটা দেখতে লাগল টেলিভিশনের পর্দায়। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে তিনজনেই। উত্তেজনা কাটানোর জন্যে ডনের চুলে আঙুল চালিয়ে দিল কিশোর। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা। কথা বলল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রান্নাঘরে ঢুকতে দেখা গেল প্রফেসরকে। রিফ্রিজারেটরের দরজা খুললেন।

রবিনকে ফোন করতে বলার আগে নিজে একবার চেষ্টা করে দেখতে চাইল কিশোর। তার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। সেটা সত্যি হয় কিনা দেখার জন্যে প্রফেসরের বাড়িতে ফোন করল।

দুটো নম্বর টিপতে না টিপতেই ওপাশে ফোন বাজতে শুরু করল। ভেসে এল একটা যান্ত্রিক কণ্ঠ, 'হারম্যান অ্যান্ড হারম্যান। কি সাহায্য করতে পারি?'

'সরি, রঙ নাম্বার!' বলে রিসিভার রেখে দিল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। ডনকে ইশারা করল।

হামাগুড়ি দিয়ে সোফাটার পেছনে চলে গেল ডন। প্লাগ খুলে ফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিল।

রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর। মুসার প্রশ্নটার জবাব দিল এতক্ষণে, 'দেখতে চাইছিলাম, আমরা ফোন করলে কম্পিউটারটা কি করে। আমার সন্দেহ ঠিক। ওবাড়ির কারোর সঙ্গে আমাদেরকে কথা বলতে দেবে না।'

ফোন করল রবিনের নম্বরে।

'কিশোর?' জবাব এল রবিনের।

'হ্যাঁ, আমি।' রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বসার ঘরের টেলিভিশনটা দেখা যাচ্ছে, ওটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'রান্নাঘরে ঢুকেছেন প্রফেসর। ফোনের কাছাকাছি আছেন। করলে এখুনি করো। তবে কম্পিউটারটা তোমাকে কথা বলতে দেবে কিনা জানি না। আমাকে দেয়নি। আমরা কি করতে চাইছি কিভাবে যেন জেনে গেছে। প্রফেসরের কাছে ফোন যেতে দিচ্ছে না। নিজেই ধরে ফেলছে। ধরে উল্টোপাল্টা জবাব দিচ্ছে।'

রবিনকে ফোন করে বসার ঘরে চলে এল কিশোর। টেলিভিশনের কাছে। মুসা আর ডন ওখানেই বসে আছে। প্রায় দম বন্ধ করে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। প্রফেসর ডেভিডসনকে দেখা যাচ্ছে। স্যান্ডউইচ বানিয়ে প্লেটে রাখলেন। একটা ফ্লাস্ক থেকে কাপে চা ঢেলে, কাপ আর স্যান্ডউইচের প্লেটটা নিয়ে সরে গেলেন। ক্যামেরার চোখ আর দেখতে পাচ্ছে না তাঁকে। ওবাড়ির

রান্নাঘরের ফোন বাজার শব্দ ভেসে এল কিশোরদের টেলিভিশনের স্পীকারে। আবার দেখা গেল প্রফেসরকে। ফোন ধরতে ফিরে এসেছেন। কাপ আর প্লেটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে রিসিভার তুললেন।

'হ্যাঁ না?' প্রফেসর বললেন।

নিশ্চয় রবিনের ফোন। স্থির দৃষ্টিতে প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোররা। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছে।

'হ্যারিসন কম্পিউটার নাকি?' প্রফেসর বললেন। 'নতুন কতগুলো পার্টস চেয়েছিলাম আপানাদের কাছে। আমার পুরানো কম্পিউটারটা গণ্ডগোল শুরু করেছে। পার্টস বদলালে হয়তো ঠিক হয়ে যেত...কি বললেন? কম্পিউটার কোম্পানি না? তাহলে কে আপনি?'

ওপাশের কথা শুনতে শুনতে রাগ ফুটল প্রফেসরের চেহারায়। 'দেখুন, আপনি কে, আমি বুঝতে পারছি না। কি পেয়েছেন আমাদের? বার বার এ ভাবে বিরক্ত করছেন কেন?'

খটাস করে রিসিভার রেখে দিলেন প্রফেসর।

আবার ফোন বাজল। রাগত দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়লেন তিনি। আর তুললেন না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

*

'প্রফেসর মনে করেছেন ফোনে আমিই বার বার হুমকি দিয়েছি,' রবিন জানাল। ফিরে এসেছে সে। 'আমার কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝতে পেরেছি। ওবাড়ির সমস্ত ফোন কল নিয়ন্ত্রণ করে ওই ভয়ানক কম্পিউটার। নিজের বিরুদ্ধে যায়, এমন কোন কথা বেরোতেও দেয় না, ঢুকতেও দেয় না।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'বুঝলে না? কম্পিউটার কোম্পানির কাছে নতুন পার্টস চেয়েছেন প্রফেসর। নিশ্চয় ফোনে। সেটা জেনে গিয়ে কোম্পানির সঙ্গে আর যোগাযোগই করতে দেয় না কম্পিউটারটা। প্রফেসর যদি ফোন করেন, সেটা যেমন কোম্পানির অফিসে পৌঁছতে দেয় না, আমার বিশ্বাস ওরা যোগাযোগ করতে চাইলেও সেটা প্রফেসরকে রিসিভ করতে দেয় না। আমাকে যেমন কথা বলতে দিল না প্রফেসরের সঙ্গে।'

বসার ঘরের প্লাগ খুলে রাখা টেলিফোনটার দিকে তাকাল একবার ডন। বলল, 'ঘরের কম্পিউটারটাই হুমকি দেয় তাঁকে, তাই না?'

লাইন বিচ্ছিন্ন করে রাখা কর্ডলেস ফোনটার দিকে তাকাল রবিন। বলল, 'তা তো বটেই। ওটা ছাড়া আর কে দেবে? নিশ্চয় মেরে ফেলার ভয় দেখায়।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'বিপদের মুখোমুখি এখন আমরাও। আমরাও এখন ওই কম্পিউটারের শত্রু। ওটা জেনে গেছে প্রফেসরের পরিবারকে আমরা সাবধান করে দিতে চাইছি।'

'কিন্তু কারণটা কি?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল মুসা। 'কেন ওদেরকে খুন করতে চায় কম্পিউটারটা?'

'বুঝতে পারছ না?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কিশোর। 'রবিন যখন প্রফেসরকে ফোনটা করল, তিনি ভেবেছেন তাঁর নতুন পার্টসের কথা জানাতে ফোন করেছে কম্পিউটার কোম্পানির লোক। কম্পিউটারটা গোলমাল শুরু করাতে পুরানো পার্টস বদলে নতুন পার্টস লাগাতে চান।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল!' চিৎকার করে উঠতে গিয়েও টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফেলল মুসা, যদিও লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া আছে ওটার, তবু বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তারমানে কম্পিউটারটা চায় না তার পার্টস বদল করে দেয়া হোক। আর চায় না বলেই নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

নাক চুলকাল মুসা। 'ভূতের চেয়েও খারাপ জিনিস! ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছে পরিবারটা। কিভাবে ঠেকানো যায় বলো তো?'

'একটাই উপায়,' জবাব দিল কিশোর। 'পাওয়ার অফ করে দিতে হবে কম্পিউটারটার। নতুন পার্টস না লাগিয়ে আর কোনভাবেই অন করা উচিত হবে না।'

'যদি নতুন পার্টস লাগালেও ঠিক না হয়?'

'আমার বিশ্বাস, হবে। গোলমালটা কোন জায়গায়, প্রফেসর নিশ্চয় জানেন। কম্পিউটারটাও জানে, ওসব পার্টস বদলালে তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্যেই পার্টস বদলাতে বাধা দিচ্ছে।'

বারো

পরদিন সকালে সাইকেলে করে ওয়েস্ট শোরে পৌঁছল চার গোয়েন্দা। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত। বাইরে থেকে স্বাভাবিকই লাগছে। কিশোরদের বাড়িটার সঙ্গে অনেক মিল। এখানে দাঁড়িয়ে কল্পনাই করতে পারবে না কেউ ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে একটা শয়তান কম্পিউটার।

কিশোরের পেছন পেছন বাড়িটার সদর দরজার দিকে এগোল মুসা, রবিন ও ডন। কিশোরের পিঠে বাঁধা একটা ব্যাকপ্যাক। বাড়ির সদর দরজার ওপর বসানো

ছোট্ট একটা ক্যামেরার চোখ নিচু হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওদেরই দিকে। ওটা চলার মৃদু ঝিরঝির শব্দও কানে আসছে। দরজার পাশে ঘণ্টা বাজানোর বোতামটা টিপল কিশোর। কোনো শব্দ নেই।

ক্যামেরাটার দিকে তাকাল ওরা। ওটা ওদের দেখতে পাচ্ছে। নিশ্চয় বেল বাজানো বন্ধ রেখেছে কম্পিউটারটা। জিভ বের করে ক্যামেরাটাকে ভেংচি কাটল ডন।

'এই ডন,' ধমক দিয়ে বলল কিশোর, 'কি করছ!'

দরজায় টোকা দিল সে। কেউ বেরোল না। আবার টোকা দিল। ক্যামেরাটা ঝিরঝির করেই চলেছে।

দরজা খুলল।

'প্রফেসর ডেভিডসন,' কিশোর বলল। 'আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

'বলো। তাড়াতাড়ি করবে। জরুরি কাজ আছে আমাদের। একটা জিনিস আনতে যেতে হবে। সারাদিনও লেগে যেতে পারে।'

অল্প কথায় যতটা পারল, প্রফেসরকে সাবধান করতে চাইল কিশোর।

'কি বলছ! অসম্ভব!' বিশ্বাস করলেন না প্রফেসর। 'হুমকি দেয়া ফোন কলগুলো তোমরাই করোনি তো? এত খবর জানো কি করে নইলে? পুলিশকে জানাব?'

বাড়ির ভেতর হলওয়েতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। কিশোরদের বাড়ির হলওয়েটার মতই দেখতে, শুধু কার্পেটটা বাদে। ওটার রঙ আলাদা। রান্নাঘরে কাজ করছেন মিসেস ডেভিডসন। ছেলেমেয়ে দুটো বাড়িতে নেই।

'প্লিজ, আমাদের কথা বিশ্বাস করুন,' রবিন বলল। 'ভীষণ বিপদের মধ্যে আছেন আপনারা। আপনাদের ওই কম্পিউটারটা আপনাদেরকে খুন করতে চাইছে।' বসার ঘরের পেছনের একটা দরজার দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

'ওখানে কম্পিউটার আছে, তোমরা জানলে কিভাবে?'

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিসেস ডেভিডসন। 'কি ব্যাপার?'

'বুঝতে পারছি না,' প্রফেসর জবাব দিলেন। 'মনে হচ্ছে এই ছেলেগুলোই ফোনে আমাদের হুমকি দিয়েছে।'

'তাই নাকি?' মিসেস ডেভিডসনের চোখে অবিশ্বাস।

'অকারণে দোষারোপ করছেন আমাদের!' রেগে উঠল মুসা। 'আমরা হুমকি দিইনি। আমরা বরং আপনাদের বাঁচাতে চাইছি। আপনার নিজের কম্পিউটারই ফোন করে হুমকি দেয়। এমন করে বানিয়েছেন, ওটা মানুষের মতই ভাবনা-চিন্তা করতে পারে, সিদ্ধান্ত নেয়। ওটাকে ফেলে দিয়ে নতুন কম্পিউটার আনবেন, সেজন্যেই খুন করতে চাইছে আপনাদের। পুরানো মালের দোকানে আপনাদের বিক্রি করে দেয়া একটা বৈদ্যুতিক ছুরি দিয়ে আরেকটু হলেই খুন করে ফেলেছিল

কিশোরকে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে সে।'

'একটা কফি মেকার আর টেলিফোন সেটও বিক্রি করে এসেছেন ওই দোকানে,' রবিন বলল। 'ও দুটোও ভীষণ জ্বালাচ্ছে কিশোরদের বাড়িতে থেকে।'

কিশোর বলল, 'আই-পীস ভাঙা যে ক্যামেরাটা বিক্রি করেছেন পুরানো মালের দোকানে, যন্ত্রণাটা ওটাই প্রথম শুরু করেছে।'

দ্বিধান্বিত মনে হলো প্রফেসরকে। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করছেন। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। 'এত সব তোমরা জানলে কি করে?'

'সেটা বলতেই তো এলাম,' জবাব দিল মুসা। 'তবে তার আগে আপনার কম্পিউটারটা বন্ধ করুন।'

'ওই কম্পিউটারটা এক ভয়ানক জিনিস!' রবিন বলল।

'উঁহু,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর, 'আমি তোমাদের কথা মানতে রাজি না। ওটা ভয়ানক হবে কিসের জন্যে? এমন ভাবে সেট করে দিয়েছি আমি, বাড়ির সমস্ত ইলেকট্রনিক আর ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি ওটাই নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের পরিশ্রম বাঁচায়, পয়সাও বাঁচায়।'

'কিন্তু আমরা যা বলছি, সেটা আমরা প্রমাণ করতে পারব,' মুসা বলল। 'আমাদের তোলা ভিডিও ক্যাসেট সহ আপনার ক্যামেরাটাও নিয়ে এসেছি। কি ঘটেছে নিজের চোখেই দেখতে পারেন। তবে বিপদ ঘটানোর আগেই কম্পিউটারটা বন্ধ করে দিন।'

স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর। কানে কানে কিছু বললেন। রান্নাঘরে চলে গেলেন মিসেস ডেভিডসন। ঘরের কোণে গিয়ে এদিকে পেছন করে দাঁড়ালেন। কি করছেন বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। ওদেরকে আড়াল করে ডায়াল করছেন তিনি।

ফিসফিস করে সঙ্গীদের বলল কিশোর, 'পুলিশকে ফোন করছেন!'

গোয়েন্দাদের চারজোড়া চোখ এখন মিসেস ডেভিডসনের দিকে। কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন মহিলা। চেহারায় অস্বস্তি।

'অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না!' কিশোর বলল। 'চলো, কেটে পড়ি!'

প্রফেসরের অলক্ষে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল ওরা।

সাইকেলে চেপে দ্রুত পেডাল করে ছুটল।

বাড়ি ফেরার আগে আর থামল না।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে কিশোরদের বাড়ির বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে বসল চারজনে। সিঁড়িটার গোড়ায় বসেছে কিশোর।

হাঁপাতে হাঁপাতে মুসা বলল, 'ধূর, মরুকগে! আমাদের কি ঠেকা পড়েছে ওদের বাঁচানোর! আমরা চাইলাম ওদের প্রাণ বাঁচাতে। আর ওরা করে পুলিশে ফোন।'

'আমি ওঁদের দোষ দিচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'হুমকি দেয়া ফোন পেয়ে পেয়ে এমনিতেই বিরক্ত হয়ে আছেন। তারপর যখন আমরা গিয়ে অবিশ্বাস্য এক গল্প শোনালাম, মেজাজ খারাপই হওয়ার কথা।'

'আবার গেলে কেমন হয়?' ডন বলল।

'মাথা খারাপ নাকি?' রবিন বলল। 'একবার পালিয়েছি, এবার আর ছাড়বে ভেবেছ? তা ছাড়া যাবই বা কেন আর?'

'না গেলে আজ রাতে কম্পিউটারটা খুন করবে ওদের,' ডনের সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা ও রবিন।

'কি করে বুঝলে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'একটা "জিনিস আনার" কথা বললেন যে প্রফেসর, ভুলে গেছ? তিনি বলেছেন, সারাদিনও লেগে যেতে পারে।' ভুরু নাচাল কিশোর, 'কী আনতে যাবেন যে সারাদিন লেগে যাবে?'

'কম্পিউটারের পার্টস!' চিৎকার করে উঠল ডন।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কম্পিউটারটা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায়, পার্টসগুলো আজকেই আনা হবে, তাহলে গেছে প্রফেসরের পরিবার। যে মুহূর্তে পার্টস বদলানোর জন্যে পাওয়ার অফ করতে যাবেন প্রফেসর, খুন করবে তাঁকে দানবটা।'

'কীভাবে?' মুসার প্রশ্ন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'কী কীভাবে?'

'কম্পিউটারের সুইচ আমরা অফ করব কীভাবে? সারা বাড়ি ভর্তি ক্যামেরা। এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে কম্পিউটারটার কাছে যাব কি করে?'

অসম্ভব মনে হলো সবার কাছেই। একটা সুপার কম্পিউটারকে ফাঁকি দেবে কী করে ওরা?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল কিশোর। টোকা দিতে থাকল নিচের ঠোঁটে। আচমকা ঝটকা দিয়ে মুখ তুলল সে। তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'পেয়েছি বুদ্ধি!'

*

মুসা ফিরে আসতে আসতে সব কিছু রেডি করে ফেলল ওরা। ডন ও রবিন কোকের বোতল, চিপস, মনোপলি বোর্ড–এ সব সাজাল বসার ঘরের কফি টেবিলের ওপর।

কিশোর গিয়ে ওপরতলা তার নিজের ঘরে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে এল ক্যামেরাটা। নিশ্চিত হলো যাতে ওদের কাজকর্ম কিছুই দেখতে না পায় কম্পিউটারটা, কিংবা কিছু না শোনে।

দরজার বেল বাজতে তাড়াহুড়া করে গিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর। মুসাকে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'এনেছ?'

'হ্যাঁ। বাবাকে অফিসে ফোন করলাম। বাবা বলল—নাও, তবে নষ্ট কোরো না।' পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাকের জিপার খুলে নতুন একটা ভিডিও ক্যামেরা বের করল মুসা। 'দুই ঘণ্টার একটা ক্যাসেট ভরা আছে। ব্যাটারিও চার্জ দেয়া, দু-ঘণ্টার বেশি চলবে। সুতরাং দুই ঘণ্টার জন্যে কোনো চিন্তা নেই।'

ক্যামেরাটা নিয়ে এসে একটা টিভি ট্রে-র ওপর রাখল কিশোর। আই-পীসের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে এমন ভাবে সেট করল যাতে বসার ঘরের বেশির ভাগটাই দেখা যায়। কফি টেবিল আর ওপরে রাখা মনোপলি বোর্ডটাও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'সবাই রেডি?' জিজ্ঞেস করল সে।

কফি টেবিলটাকে ঘিরে তিন দিকে বসে পড়ল রবিন, মুসা ও ডন। 'রেডি,' জবাব দিল মুসা।

'মন দিয়ে শোনো এখন,' কিশোর বলল, 'ভালমত অভিনয় করবে। কোনোভাবেই যাতে বোঝা না যায় যে অভিনয় করা হচ্ছে। একেবারে বাস্তব হওয়া চাই দৃশ্যটা। ক্যামেরার দিকে মুহূর্তের জন্যেও তাকাবে না কেউ। বুঝতে দেবে না কিছু। ঠিক আছে?'

সবাই মাথা ঝাঁকাতে ক্যামেরার বোতাম টিপে দিয়ে কিশোরও গিয়ে বসে পড়ল টেবিলের খালি পাশটায়। দুই ঘণ্টা ধরে একটানা মনোপলি খেলল ওরা। ক্যাসেট শেষ হয়ে গেলে তারপর উঠল।

কি উঠেছে দেখার জন্যে টেপ রিওয়াইন্ড করে শুরুতে নিয়ে এল কিশোর। টেলিভিশনে চালিয়ে কয়েক মিনিট দেখল নিজেদের মনোপলি খেলা। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'খুব সুন্দর। বোঝাই যায় না কিছু। বোকা বানানো যাবে কম্পিউটারকে।'

'এখন তাহলে রওনা দিচ্ছি আমরা?' রবিনের প্রশ্ন। 'সব কিছু ঠিকঠাক মত নেয়া হয়েছে তো?'

'হয়েছে,' কিশোর বলল। 'প্রয়োজন মনে করলে আরেকবার চেক করা যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবে, পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বেরোতে হবে আমাদের। কোনোভাবেই যেন টের না পায় কম্পিউটারটা।'

টিভি ট্রে-টা টেনে এনে টেলিভিশনের সামনে রাখল কিশোর। দোতলায় গিয়ে ক্যামেরাটা নিয়ে এল। ট্রে-তে এমন ভাবে রাখল যাতে লেন্সের চোখটা সরাসরি টেলিভিশনের পর্দার দিকে থাকে। ক্যামেরা বসানো হয়ে গেলে লেন্সের ওপর থেকে টেপ খুলে কার্ডবোর্ডের ঢাকনা সরাল সে।

এই মুহূর্ত থেকে ওদেরকে দেখতে শুরু করেছে কম্পিউটারটা। পরের দুই ঘণ্টা ধরে একই দৃশ্য দেখতে থাকবে, বসার ঘরে বসে ওদের মনোপলি খেলার

দৃশ্য। কল্পনাই করতে পারবে না ওকে ফাঁকি দিয়ে ওরা বেরিয়ে গেছে, সুইচ অফ করে ওর শয়তানি খেলা খতম করার জন্যে।

তেরো

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজা। সাইকেলগুলো রয়েছে ওঅর্কশপের কাছে।

একটা রিমোট কন্ট্রোল খেলনা গাড়ি আর ঘরে বানানো দুটো ওয়াকি-টকি ব্যাকপ্যাকে ভরে কাঁধে ঝোলাল ডন। গাড়িটা তার নিজের। ওয়াকি-টকি দুটো তিন গোয়েন্দার সম্পত্তি, কিশোরের তৈরি, গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহারের জন্যে।

হাতে মাত্র দু'ঘণ্টা সময়। এর মাঝে কাজ সারতে হবে। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালাল ওরা। সহজ বুদ্ধি। চুপচাপ প্রফেসর ডেভিডসনের পেছনের আঙিনায় ঢুকে ফিউজ বক্স থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। আশা করল, ওদের মনোপলি খেলার ওপর চোখ রাখবে কম্পিউটারটার, কাজেই বাড়ির পেছন দিয়ে ওদেরকে এগোতে দেখবে না। তা ছাড়া নতুন কম্পিউটার নিয়ে এলে কি ভাবে বাধা দেবে ডেভিডসনদের, কিভাবে খুন করবে, সেটা নিয়েও মাথা ঘামানোয় ব্যস্ত থাকবে ওটার ইলেকট্রনিক মগজ। সুতরাং ওদের দিকে অত খেয়াল দিতে পারবে না।

প্রফেসরের বাড়ির পাশে রাস্তার মোড়ে ডনকে পাহারায় বসাল কিশোর। বাড়ির দিকে নজর রাখবে সে। কেউ এলে সাবধান করে দেবে ওয়াকি-টকিতে। একটা ছোট্ট ছেলেকে গাড়ি নিয়ে খেলতে দেখলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

সাইকেল রেখে পেছনের নিচু দেয়ালের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। দেয়ালের কাছে এসে বসে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে পার হলো জানালার কাছটা। সিকিউরিটি ক্যামেরার নজর এড়াল। আরেকটু এগোতেই ঝনঝন শব্দ কানে এল। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল তিনজনে।

'শুনলে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে তার। 'কিসের শব্দ...।'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই জবাবটা পেয়ে গেল। একটা কুকুর। বাড়ির কোণ ঘুরে ছুটে আসছে। গলার শিকলটা ঝনঝন শব্দ করছে। কিভাবে যেন খুলে ফেলেছে।

ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল কুকুরটা। চাপা গরগর করল। মাটি শুঁকল।

বাঘা কুকর নয়। ছোট জাতের। লেজটা গুটিয়ে ফেলেছে দুই পায়ের ফাঁকে।

মাথা নোয়ানো।

'হেই কুকুর, হেই! আয় এদিকে!' চাপা স্বরে ডাক দিল মুসা। জন্তু-জানোয়ারেরা সহজেই তার ভক্ত হয়ে যায়। কুকুরটা কাছে এসে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কানের পেছনটা চুলকে দিল মুসা। মুহূর্তে তার বশ হয়ে গেল ওটা। জিভ বের করে নাক চাটতে যেতেই নাক-মুখ কুঁচকে বাধা দিল মুসা, 'উঁহুঁ! আমি এ সব পছন্দ করি না! দেখি, সর।'

রবিনের দিকে সরে গেল কুকুরটা। ওকে শুঁকল। কিশোরকেও শুঁকল। তারপর দৌড়ে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল।

কুকুরটা বিপজ্জনক না। ওটার পেছন পেছন হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

এক কোণে দাঁড়িয়ে পেছনের চত্বরটা ভালমত দেখল কিশোর। পেছনের বারান্দায় রান্নাঘরের দরজার ওপরে দেখতে পেল প্রথম ক্যামেরাটা। টেবিল ফ্যানের মত এপাশ ওপাশ নড়ছে। চোখ রেখেছে চত্বরে। লেন্সের ওপর ছোট একটা লাল আলো জ্বলছে। রান্নাঘরের দরজার পাল্লার নিচের অংশ কেটে কুকুর ঢোকার একটা ফোকর বানানো হয়েছে। সেটাতে আরেকটা পাল্লা এমন ভাবে স্প্রিং দিয়ে লাগানো, যাতে কুকুরটা ঢুকতে-বেরোতে পারে, আর পাল্লাটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। তারমানে ওই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

দুই সহকারীর দিকে ফিরে ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'ক্যামেরাটা দেখতে পাচ্ছ? যেই ওটার চোখ অন্যপাশে সরে যাবে, এক দৌড়ে ফিউজ বক্সটার কাছে চলে যাব।'

'আমরা কি করব?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সাহায্যের প্রয়োজন হলে ডাকব। তখন নিজেরাও বুঝতে পারবে।'

ক্যামেরাটার দিকে তাকাল আবার কিশোর। অন্য দিকে সরে গিয়েছিল। এখন এদিকে ঘুরছে। রবিন আর মুসাকে বসে পড়তে বলে ঝট করে নিজেও বসে পড়ল দেয়াল ঘেঁষে।

ক্যামেরার চোখ যেই সরে যেতে শুরু করেছে, অমনি লাফিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিল কিশোর। সোজা ফিউজবক্সের কাছে এসে থামল। ক্যামেরার চোখ তখন আরেক দিকে। ওটা আবার এদিকে ঘোরার আগেই সেরে ফেলতে হবে কাজ। ফিউজ বক্সের ধাতব ঢাকনাটা খোলার চেষ্টা করল সে। মরচে পড়ে আটকে গেছে। নড়লও না। টানাটানি করতে গিয়ে আঙুলই কাটল শুধু, কাজের কাজ কিছু হলো না।

ঘুরে এদিকে সরতে শুরু করেছে আবার চোখটা। আঙুলের ব্যথার পরোয়া করল না কিশোর। চোখটা তাকে দেখে ফেলার আগেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে

দিতে না পারলে ভীষণ বিপদ হবে। ধাতব ঢাকনার কিনারে আঙুল বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল। কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলে ফাঁক হয়ে গেল ঢাকনাটা। চেপে ধরার সুযোগ পেয়ে আবার টান মারল। সারি সারি সুইচ একের পর এক অফ করে দিতে লাগল সে। বাড়ির ভেতরে আলো নিভে যেতে দেখল। কিন্তু ক্যামেরার ঘোরা বন্ধ হচ্ছে না। যে সুইচগুলো নামানো বাকি আছে ওগুলোও নামিয়ে দিতে লাগল। ক্যামেরার চোখটা প্রায় ওর ওপর চলে এসেছে। শেষ সুইচটাও যখন নামিয়ে দিল, ক্যামেরার চোখটা তখন একেবারে ওর ওপর স্থির। ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল ওটার। লাল আলোটা নিভে গেল।

'যাক! বাঁচা গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'গেছে কম্পিউটারটা!'

মুসা ও রবিনের কাছে ফেরার সময় মৃদু গুঞ্জন কানে এল। ফিরে তাকাল। বাড়ির ভেতর থেকে আসছে। আওয়াজটা বাড়তে লাগল ক্রমে। আলো জ্বলে উঠল ঘরে। সিকিউরিটি ক্যামেরাটার দিকে চোখ চলে গেল ওর। দু'তিন বার মিটমিট করে জ্বলে উঠল ওটার লাল আলো।

ঝাঁপ দিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল সে। ক্যামেরার চোখ কি দেখে ফেলল ওকে?

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'বুঝলাম না,' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল কিশোর। 'সমস্ত সুইচ অফ করে দিলাম। বাতি চলে গেল। ক্যামেরাটাও থেমে গেল। তাহলে বিদ্যুৎ পেল কোথায় আবার?'

'ব্যাক-আপ জেনারেটর!' মুসা বলল। 'নিশ্চয় নিরাপত্তার জন্যে। ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ পেয়ে যায়। ডিরেক্ট লাইন থেকে জেনারেটরের লাইনে সরে গেছে কম্পিউটারটা।'

দম আটকে ফেলল কিশোর। 'তারমানে কম্পিউটারটা এখনও চালু!'

'তাই তো হওয়ার কথা। ঘরের মধ্যে আলো নিভে গিয়ে আবার জ্বলে উঠল। কম্পিউটারের সঙ্গেও নিশ্চয় লাইন দেয়া আছে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'তারমানে জেনারেটরটাকেও এখন বন্ধ করতে হবে।'

মুসা বলল, 'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বাড়ির মাটির নিচের ঘরে আছে। ঢুকতেই দেবে না তোমাকে ওখানে কম্পিউটারটা।'

ঝোপের আড়ালে দেয়ালের গা ঘেঁষে হেলান দিল কিশোর। চিন্তিত।

রবিন বলল, 'এত কিছু করেও কোনো লাভ হলো না।'

'ক্যামেরাটা তোমাকে দেখেনি তো?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কি করে বলি,' জবাব দিল কিশোর। 'পাওয়ার যখন ফিরে এল, ওটার চোখ তখন ঠিক আমার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সরে গেছি অবশ্য। কিন্তু তাতে

কি? ইলেকট্রনিক চোখের সঙ্গে পারা কঠিন। হয়তো দেখেছে।'

'কি করবে?' ভুরু নাচাল মুসা। 'ফিরে যাব নাকি?'

'দাঁড়াও, ভাবতে দাও!' অনেকক্ষণ ধরে ভাবল কিশোর। তারপর মাথা দুলিয়ে যেন নিজেকেই বোঝাল, 'বুদ্ধি একটা আছে। যদি কম্পিউটারটাকে অতিরিক্ত শক্তি খরচ করতে বাধ্য করতে পারি, প্রচণ্ড চাপ দিয়ে নিজেই জ্বালিয়ে দেবে জেনারেটর।'

'কিভাবে?' বুঝতে পারল না রবিন।

'সমস্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিই বিদ্যুতে চলে,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'একসঙ্গে যদি অনেক বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে বাধ্য করা যায় ওটাকে, অতিরিক্ত চাপ পড়ে যাবে জেনারেটরের ওপর। তাতে জ্বলে যেতে পারে মোটর। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি যদ্দূর জানি,' মুসা বলল, 'এ ভাবে জেনারেটরের মোটর জ্বালানো যায় না।'

'তাহলে শর্ট সার্কিট করে দিতে হবে। কিছু জেনারেটর আছে, অতিরিক্ত চাপ পড়লে অটোম্যাটিক সুইচ অফ হয়ে যায়। সে-রকম হলে ঝামেলা কমে গেল।'

'কিন্তু অতিরিক্ত শক্তি খরচ করতে বাধ্য করব কিভাবে?'

আবার ভাবতে বসল কিশোর। বাড়ির সামনের দিক থেকে ডনের গাড়ি চালানোর শব্দ কানে আসছে।

জ্বলজ্বল করে উঠল কিশোরের চোখের তারা। 'কম্পিউটারটাকে জানাতে হবে বাড়িতে বাইরের লোক ঢুকেছে। মুসা, জলদি গিয়ে ডনকে ডেকে নিয়ে এসো। কুকুর ঢোকার দরজাটা ব্যবহার করব।'

'কিন্তু...'

'আহ্, তাড়াতাড়ি করো! ডেকে নিয়ে এসোগে।'

চোদ্দ

বাড়ির পেছনে ঝোপের আড়ালে জরুরি মিটিঙে বসেছে চার গোয়েন্দা। কিভাবে কি করা হবে বুঝিয়ে দিতে লাগল কিশোর। কুকুরটা বেরিয়ে এসেছে আবার। ডন ওটাকে আদর করার ছুতোয় আটকে ফেলেছে।

ডনের জুতো থেকে ফিতে খুলে নিয়ে দুটো ওয়াকি-টকির একটা গাড়ির ছাতে বেঁধে দিল কিশোর। রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে বলল, 'গাড়িটাকে কন্ট্রোল করব আমি।' মুসা ও রবিনকে বলল, 'তোমরা অন্য ওয়াকি-টকিটা ব্যবহার

করবে। ডন, কুকুরটাকে আটকে রাখো।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। ঘুরে আধ চক্কর দিয়ে ফিরে আসছে ক্যামেরাটা। চট করে আড়ালে সরে এল কিশোর।

'সবাই রেডি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি গেলাম।'

অন্য দিকে সরে যাচ্ছে ক্যামেরা।

পেছনের দেয়াল ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল কিশোর। ক্যামেরার চোখ আরেক দিকে থাকতে থাকতেই এক দৌড়ে চলে এল রান্নাঘরের দরজার কাছে। ফিরে এল ক্যামেরাটা। কিশোর যেখানে রয়েছে, ঠিক তার ওপরেই রয়েছে এখন চোখটা। তবে দেখতে পাচ্ছে না ওকে, তার কারণ, দরজার পাল্লা ঘেঁষে যেখানটায় রয়েছে সে, সে-জায়গাটা ক্যামেরার চোখের আওতার বাইরে।

ওয়াকি-টকি অন করে মুখের কাছে তুলে আনল সে। ফিসফিস করে সহকারীদের জানাল, 'রেডি হও। আমি কাজ শুরু করছি।'

কুকুর ঢোকার দরজাটা ঠেলে খুলে ওয়াকি-টকি বাঁধা গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে। নিজেও মাথা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গাড়িটাকে পাঠিয়ে দিল রান্নাঘরের শেষ মাথায়।

হঠাৎ করেই কানে এল মুসা ও রবিনের কণ্ঠ। গাড়িতে বাঁধা ওয়াকি-টকিতে শোনা যাচ্ছে ওদের চিৎকার।

'অ্যাই, বোকা কম্পিউটার!' মুসা বলছে, 'হাঁদা কোথাকার! তোর জারিজুরি খতম!'

রবিন মুসার মত তুই-তোকারি করতে পারল না। হাজার হোক এত বুদ্ধিমান একটা মগজের সঙ্গে কথা বলছে, হোক না সেটা যন্ত্র। বলল, 'তুমি ভেবেছ ঘরে বসে আমরা মনোপলি খেলছি? মোটেও না। ওটা ক্যাসেট চলছে। আমরা এখানে। তোমার সুইচ অফ করে দিতে এসেছি।'

রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গাড়িটার মোড় ঘুরিয়ে বসার ঘরে পাঠিয়ে দিল কিশোর।

ওয়াকি-টকিতে বসার ঘর থেকে ভেসে এল আবার রবিনের কণ্ঠ, 'এতই বোকার বোকা তুমি, মিস্টার কম্পিউটার, আমাদের দেখতেও পাবে না। আর আমাদের ঠেকাতে পারবে না তুমি।'

পটাপট সারা বাড়ির আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। আনন্দে উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। হয়ে গেছে কাজ। ফাঁদে ধরা দিয়েছে কম্পিউটার। নিজের নিয়ন্ত্রণে যত যন্ত্রপাতি রয়েছে, সব চালু করতে আরম্ভ করেছে। মরিয়া হয়ে ওদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

রবিনের দেখাদেখি মুসারও অভদ্রতা করতে বাধল। তুমি করেই বলল, 'শোনো মিয়া কম্পিউটার, হাতির মত দেহই আছে শুধু একখান, মাথায় ঘিল

বলতে কিছু নেই। আমরা তোমার সুইচ বন্ধ করতে আসছি। দেখব কি করে ঠেকাও?'

জানালার ধাতব খড়খড়িগুলো সব একসঙ্গে নেমে যেতে শুরু করল। কট কট শব্দ তুলে আটকে যেতে থাকল ওগুলোর লক। জানালা আটকে দিচ্ছে। ওপথে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। নিজের নিয়ন্ত্রণে যত অস্ত্র আছে, সব শত্রুর ওপর প্রয়োগের চেষ্টা করল কম্পিউটারটা। কিন্তু চেষ্টাই সার। যন্ত্রপাতি চালাতে শক্তি প্রয়োজন।

ফলে যা ঘটার তাই ঘটল। চাপ পড়ল জেনারেটরের ওপর। বাড়ির ভেতরের আলোগুলো মিটমিট শুরু করল। যে সব খড়খড়ি এখনও পুরোপুরি নামেনি, ওগুলো মাঝপথে থেমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল সতর্ক সঙ্কেত বাজানোর ঘণ্টা।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত নড়াচড়া। থেমে গেল সব কিছু।

মাথার ওপরের ক্যামেরাটার দিকে তাকাল কিশোর। স্থির হয়ে আছে ওটা। লাল আলো নিভে গেছে।

হয়েছে! হয়েছে! কাজ হয়েছে! উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করেছে কিশোর। নিশ্চয় অটোম্যাটিক সুইচ ছিল। জেনারেটর বাঁচানোর জন্যে আপনাআপনি অফ করে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ।

মরে গেছে অতি বুদ্ধিমান কম্পিউটারটা!

মুসাদের ডাক দিল সে।

কুকুর ঢোকার দরজাটা দিয়ে ডনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। রান্নাঘরের দরজার ছিটকানি খুলে দিতে বলল।

ভেতরে ঢুকল সবাই। একটা আলোও জ্বলছে না। অন্ধকার। তবে আর কোনো ভয় নেই।

গাড়িটা আনতে বসার ঘরে চলে গেল ডন। তিন গোয়েন্দা চলল কম্পিউটার রুমে, দানব-যন্ত্রটার অবস্থা দেখতে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। কম্পিউটারের অসংখ্য আলোর একটাও জ্বলছে না আর। প্যানেল আর মনিটরগুলো অন্ধকার। কম্পিউটারের সমস্ত সার্কিট ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পাওয়ার লাইনের প্লাগটা হ্যাঁচকা টানে সকেট থেকে খুলে নিয়ে এল মুসা। অতি সতর্কতা। কোনো ভাবেই যাতে আর প্রাণ ফিরে না পায় খুনে কম্পিউটার।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'এখন কি করব?'

'বসে থাকব প্রফেসরের জন্যে। সব কথা জানাতে হবে তাঁকে। ফিরে এসে যদি পার্টস না বদলেই আবার অন করেন কম্পিউটার, আমাদের এত কষ্ট সব বিফলে যাবে।'

বাড়ির গেটে ওদের দেখেই রেগে গেলেন প্রফেসর। 'আবার এসেছ তোমরা? দাঁড়াও, এখুনি পুলিশকে ফোন করছি আমি।'

কিশোরও রেগে গেল, 'পুলিশকে আপনি ফোন করবেন কি? ফোন তো করব এখন আমরা। ভয়ানক এক কম্পিউটার বানিয়ে বসে আছেন। এতই ভয়ানক, পুরানো যেসব ইলেকট্রিক্যাল আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বেচে দিয়ে এসেছেন, এখানে বসেই সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করছিল ওটা। আপনি তো যেতেনই, আরেকটু হলে আমরাও খুন হয়ে যাচ্ছিলাম।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। ওর বলার ভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর দ্বিধায় ফেলে দিল তাঁকে। কিছুটা নরম হলেন। বললেন, 'এসো, ঘরে এসো। শুনব সব।'

*

বাড়ির পথ ধরল যখন আবার গোয়েন্দারা, অন্ধকার হয়ে আসছে তখন। অনেকখানি পথ যেতে হবে।

'একটা ফোন বুথে ঢুকে বাড়িতে একটা ফোন করে দেয়া দরকার,' রবিন বলল, 'মা যাতে চিন্তা না করে।'

কথাটা মনে ধরল সবারই। বড় একটা দোকান দেখে সেটার সামনে এসে সাইকেল থেকে নামল। ভেতরে ঢুকতে যাবে, সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল মুসা। অস্ফুট স্বরে বলল, 'খাইছে!'

সবাই তাকাল সাইনবোর্ডটার দিকে। নিয়ন আলোয় দোকানের নামটা লেখা। কম্পিউটারের দোকান।

'বাবারে!' মুসার মতই চমকে গেল রবিন। 'আবারও কম্পিউটার! আমি আর ঢুকছি না!'

'তারচেয়ে বরং একটা আইসক্রীমের দোকান খুঁজে বের করি চলো,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'আইসক্রীমও খাওয়া যাবে, ফোনও করা যাবে।'

ঠিক! ঠিক! ঠিক! একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল অন্য তিন গোয়েন্দা।

-: শেষ :-